ব্যোমকেশের গল্প

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

ফোন :—৩৪-১৭৫৪ গ্রাম :—Publicasun, Cal.

তৃতীয় মুদ্রণ

শ্রাবণ—১৩৬১

দুই টাকা আট আনা

ব্যোমকেশের গল্প

ব্যোমকেশের গল্প

রক্তমুখী নীলা

টেবলের উপর পা তুলিয়া ব্যোমকেশ পা নাচাইতেছিল। খোলা সংবাদপত্রটা তাহার কোলের উপর বিস্তৃত। শ্রাবণের কর্ম্মহীন প্রভাতে দু'জনে বাসায় বসিয়া আছি; গত চারদিন ঠিক এইভাবে কাটিয়াছে। আজিকারও এই ধরাস্রাবি ধূসর দিনটা এই ভাবে কাটিবে, ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিলাম।

ব্যোমকেশ কাগজে মগ্ন; তাহার পা স্বেচ্ছামত নাচিয়া চলিয়াছে। আমি নীরবে সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি; কাহারও মুখে কথা নাই। কথা বলার অভ্যাস যেন ক্রমে ছুটিয়া যাইতেছে।

কিন্তু চুপ করিয়া দু'জনে কাঁহাতক বসিয়া থাকা যায়? অবশেষে যাহোক একটা কিছু বলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলাম, 'খবর কিছু আছে?'

ব্যোমকেশ চোখ না তুলিয়া বলিল, 'খবর গুরুতর—দু'জন দাগী আসামী সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে।'

একটু আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে তাঁরা?'

'একজন হচ্ছেন শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন—তিনি মুক্তিলাভ করেছেন বিচিত্রা নামক টকি হাউসে; আর একজনের নাম শ্রীযুত রমানাথ নিয়োগী—ইনি মুক্তিলাভ করেছেন আলিপুর জেল থেকে দশদিনের

পুরানো খবর, তাই আজ 'কালকেতু' দয়া করে জানিয়েছেন।' বলিয়া সে ক্রুদ্ধ-হতাশ ভঙ্গিতে কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বুঝিলাম সংবাদের অপ্রাচুর্যে বেচারা ভিতরে ভিতরে ধৈর্য্য হারাইয়াছে। অবশ্য আমাদের পক্ষে নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাই বলিয়া এই বর্ষার দিনে তাজা মুড়ি-চাল-ভাজার মত সংবাদপত্রে দু'একটা গরম গরম খবর থাকিবে না—ইহাই বা কেমন কথা! বেকারের দল তবে বাঁচিয়া থাকিবে কিসের আশায়?

তবু, 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।' বলিলাম, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনকে ত চিনি, কিন্তু রমানাথ নিয়োগী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। তিনি কে?'

ব্যোমকেশ ঘরময় পায়চারি করিল, জানালা দিয়া বাহিরে বৃষ্টি-ঝাপ্সা আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'নিয়োগী মহাশয় নিতান্ত অপরিচিত নয়। কয়েক বছর আগে তাঁর নাম খবরের কাগজে খুব বড় বড় অক্ষরেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের স্মৃতি এত হ্রস্ব যে দশ বছর আগের কথা মনে থাকে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর ত পেলুম না। কে তিনি?'

'তিনি একজন চোর। ছিঁচ্‌কে চোর নয়, ঘটিবাটি চুরি করেন না। তাঁর নজর কিছু উঁচু—'মারি ত গণ্ডার লুটি ত ভাণ্ডার।' বুদ্ধিও যেমন অসাধারণ সাহসও তেমনি অসীম।'—ব্যোমকেশ স-খেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, 'আজকাল আর এরকম লোক পাওয়া যায় না।'

বলিলাম, 'দেশের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর নাম বড় বড় অক্ষরে খবরের কাগজে উঠেছিল কেন?'

'কারণ শেষ পর্য্যন্ত তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁর বিচার হয়েছিল।' টেবলের উপর সিগারেটের টিন রাখা ছিল,

একটা সিগারেট তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ যত্ন সহকারে ধরাইল ; তারপর আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'দশ বছর হয়ে গেল কিন্তু এখনও ঘটনাগুলো বেশ মনে আছে। তখন আমি সবেমাত্র এ কাজ আরম্ভ করেছি—তোমার সঙ্গে দেখা হবারও আগে—'

দেখিলাম, ঔদাস্যভরে বলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই নিজের স্মৃতি-কথায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষার দিনে যখন অন্য কোনও মুখরোচক খাদ্য হাতের কাছে নাই, তখন স্মৃতি-কথাই চলুক—এই ভাবিয়া আমি বলিলাম, 'গল্পটা বল শুনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গল্প কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা কারণে রহস্যময় হয়ে আছে। পুলিশ খেটেছিল খুব এবং বাহাদুরীও দেখিয়েছিল অনেক। কিন্তু আসল জিনিসটি উদ্ধার করতে পারে নি।'

'আসল জিনিসটি কি ?'

'তবে বলি শোন। সে সময় কলকাতা শহরে হঠাৎ জহরৎ চুরির খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল ; আজ জহরলাল হীরালালের দোকানে চুরি হচ্ছে, কাল দত্ত কোম্পানীর দোকানে চুরি হচ্ছে--এইরকম ব্যাপার। দিন পনেরোর মধ্যে পাঁচখানা বড় বড় দোকান থেকে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকার হীরা জহরৎ লোপাট হয়ে গেল। পুলিশ সজোরে তদন্ত লাগিয়ে দিলে।

'তারপর একদিন মহারাজা রমেন্দ্র সিংহের বাড়ীতে চুরি হল। মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের পরিচয় দিয়ে তোমায় অপমান করব না, বাঙালীর মধ্যে তাঁর নাম জানে না এমন লোক কমই আছে। যেমন ধনী তেমনি ধার্ম্মিক। তাঁর মত সহৃদয় দয়ালু লোক আজ-কালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। সম্প্রতি তিনি একটু বিপদে জড়িয়ে

পড়েছেন—কিন্তু সে থাক্। ভাল ভাল জহরৎ সংগ্রহ করা তাঁর একটা সখ ছিল; বাড়ীতে দোতলার একটা ঘরে তাঁর সংগৃহীত জহরৎগুলি কাচের শো-কেসে সাজান থাকত। সতর্কতার অভাব ছিল না; সেপাই শান্ত্রী চৌকিদার অষ্টপ্রহর পাহারা দিত। কিন্তু তবু একদিন রাত্রিবেলা চোর ঢুকে দু'জন চৌকিদারকে অজ্ঞান করে তাঁর কয়েকটা দামী জহরৎ নিয়ে পালাল।

'মহারাজের সংগ্রহে একটা রক্তমুখী নীলা ছিল, সেটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নীলাটাকে মহারাজ নিজের ভাগ্যলক্ষ্মী মনে করতেন; সর্ব্বদা আঙুলে পরে থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন আগে সেটা আংটিতে আলগা হয়ে গিয়েছিল বলে খুলে রেখেছিলেন। বোধহয় ইচ্ছে ছিল, স্যাকরা ডাকিয়ে মেরামত করে আবার আঙুলে পরবেন। চোর সেই নীলাটাও নিয়ে গিয়েছিল।

'নীলা সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি না বলতে পারি না। নীলা জিনিসটা হীরে, তবে নীল হীরে। অন্যান্য হীরের মত কিন্তু কেবল ওজনের ওপরই এর দাম হয় না; অধিকাংশ সময়—অন্ততঃ আমাদের দেশে—নীলার দাম ধার্য্য হয় এর দৈবশক্তির ওপর। নীলা হচ্ছে শনিগ্রহের পাথর। এমন অনেক শোনা গেছে যে, পয়মন্ত নীলা ধারণ করে কেউ কোটিপতি হয়ে গেছে, আবার কেউ বা রাজা থেকে ফকির হয়ে গেছে। নীলার প্রভাব কখনও শুভ, কখনও বা ঘোর অশুভ।

'একই নীলা যে সকলের কাছে সমান ফল দেবে তার কোনও মানে নেই। একজনের পক্ষে যে নীলা মহা শুভকর, অন্যের পক্ষে সেই নীলাই সর্ব্বনেশে হ'তে পারে। তাই নীলার দাম তার ওজনের ওপর নয়। বিশেষতঃ রক্তমুখী নীলার। পাঁচ রতি ওজনের একটী নীলার জন্যে আমি একজন মাড়োয়ারীকে এগারো হাজার টাকা দিতে দেখেছি। লোকটা

যুদ্ধের বাজারে চিনি আর লোহার ব্যবসা করে ডুবে গিয়েছিল, তারপর—; কিন্তু সে গল্প আর একদিন ব'লব। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দু নই, ভূত-প্রেত, মারণ-উচাটন বিশ্বাস করি না, কিন্তু রক্তমুখী নীলার অলৌকিক শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাস।

'সে যাক্, যা বলছিলুম। মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের নীলা চুরি যাওয়াতে তিনি মহা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন। তাঁর প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার মণি-মুক্তো গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাছে নীলাটা যাওয়াই সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে চোর ধরা পড়ুক আর না পড়ুক, তাঁর নীলা যে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে, তাকে তিনি দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। পুলিশ ত যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলই, এখন আরও উঠে পড়ে লেগে গেল। পুলিশের সব চেয়ে বড় গোয়েন্দা নির্ম্মলবাবু তদন্তের ভার গ্রহণ করলেন।

'নির্ম্মলবাবুর নাম বোধ হয় তুমি শোন নি, সত্যিই বিচক্ষণ লোক। তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল, এখন তিনি রিটায়ার করেছেন। যাহোক, নির্ম্মলবাবু তদন্ত হাতে নেবার সাত দিনের মধ্যেই জহরৎ-চোর ধরা পড়ল। চোর আর কেউ নয়—এই রমানাথ নিয়োগী। তার বাড়ী খানাতল্লাস করে সমস্ত চোরাই মাল বেরুল, কেবল সেই রক্তমুখী নীলাটা পাওয়া গেল না।

'তারপর যথাসময়ে বিচার শেষ হয়ে রমানাথ বারো বছরের জন্যে জেলে গেল। কিন্তু নীলার সন্ধান তখনও শেষ হল না। রমানাথ কোনও স্বীকারোক্তি করলে না, শেষ পর্য্যন্ত মুখ টিপে রইল। ওদিকে মহারাজ রমেন্দ্র সিংহ পুলিশের পিছনে লেগে রইলেন। পুরস্কারের লোভে পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে চল্‌ল।

'রমানাথ জেলে যাবার মাস তিনেক পরে নির্ম্মলবাবু খবর পেলেন যে

নীলাটা রমানাথের কাছেই আছে, কয়েকজন কয়েদী নাকি দেখেছে। জেলে পুলিশের গুপ্তচর কয়েদীর ছদ্মবেশে থাকে তা ত জান, তারাই খবর দিয়েছে। খবর পেয়ে নির্ম্মলবাবু হঠাৎ একদিন রমানাথের 'সেলে' গিয়ে খানাতল্লাস করলেন, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। রমানাথ তখন আলিপুর জেলে ছিল, কোথায় যে নীলাটা সরিয়ে ফেললে কেউ খুঁজে বার করতে পারলে না।

'সেই থেকে নীলাটা একেবারে লোপাট হয়ে গেছে। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে—'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর কতকটা যেন নিজ মনেই বলিল, 'মন্দ প্রব্লেম নয়। এলাচের মত একটা নীল রঙের পাথর—একজন জেলের কয়েদী সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখলে! কেসটা যদি আমার হাতে আসত চেষ্টা করে দেখতুম; দু'হাজার টাকা পুরস্কারও ছিল—'

ব্যোমকেশের অর্দ্ধ স্বগতোক্তি ব্যাহত করিয়া সিঁড়ির উপর পদশব্দ শোনা গেল। আমি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'লোক আসছে। ব্যোমকেশ, বোধ হয় মক্কেল!'

ব্যোমকেশ কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, 'বুড়ো লোক, দামী জুতো—এই বর্ষাতেও মচ মচ করছে না; সম্ভবতঃ গাড়ীমোটরে ঘুরে বেড়ান, সুতরাং বড়মানুষ। একটু খুঁড়িয়ে চলেন।'—হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'অজিত, তাও কি সম্ভব? জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখ ত প্রকাণ্ড একখানা রোল্‌স রয়েস সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিনা—আছে। ঠিক ধরেছি তা হলে। কি আশ্চর্য্য যোগাযোগ অজিত! যাঁর কথা হচ্ছিল সেই মহারাজ রমেন্দ্র সিংহ আসছেন—কেন আসছেন জান?'

আমি সোৎসাহে বলিলাম, 'জানি, খবরের কাগজে পড়েছি। তাঁর সেক্রেটারি হরিপদ রক্ষিত সম্প্রতি খুন হয়েছে—সেই বিষয়ে হয়ত—'

দ্বারে টোকা পড়িল।

দ্বার খুলিয়া ব্যোমকেশ 'আসুন মহারাজ' বলিয়া যে লোকটিকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল, সাময়িক কাগজ-পত্রে তাঁহার অনেক ছবি দেখিয়া থাকিলেও আসল মানুষটিকে এই প্রথম চাক্ষুষ করিলাম। সঙ্গে লোক-লস্করের আড়ম্বর নাই—অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের মানুষ; ঈষৎ রুগ্ন ক্ষীণ চেহারা—পায়ের একটু দোষ থাকাতে একটু খোঁড়াইয়া চলেন। বয়স বোধ করি ষাট পার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বার্দ্ধক্যের লোলচর্ম্ম তাহার মুখখানিকে কুৎসিত করিতে পারে নাই—বরং একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতা মুখের জরাজনিত বিকারকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

মহারাজ একটু হাসিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময়ও প্রকাশ পাইল। বলিলেন, 'আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি আসব সেটা কি আগে থাকতে অনুমান করে রেখেছিলেন নাকি?'

ব্যোমকেশও হাসিল।

'এত বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতেও পারি নি। কিন্তু আপনার সেক্রেটারার মৃত্যুর কোন কিনারাই যখন পুলিশ করতে পারলে না, তখন আশা হয়েছিল হয়ত মহারাজ স্মরণ করবেন। কিন্তু আসুন, আগে বসুন।'

মহারাজ চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল, পুলিশ ত কিছুই করতে পারলে না; তাই ভাবলুম দেখি যদি আপনি কিছু করতে পারেন। হরিপদর ওপর আমার একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল—তা ছাড়া তার মৃত্যুর ধরণটাও এমন ভয়ঙ্কর—' মহারাজ একটু থামিলেন—'অবশ্য সে সাধু লোক ছিল না; কিন্তু

আপনারা ত জানেন, ঐরকম লোককে সৎপথে আনবার চেষ্টা করা আমার একটা খেয়াল। আর, সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে হরিপদ নেহাৎ মন্দ লোক ছিল না। কাজকর্ম্ম খুবই ভাল করত; আর কৃতজ্ঞতাও যে তার অন্তরে ছিল সে প্রমাণও আমি অনেকবার পেয়েছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মাপ করবেন, হরিপদবাবু সাধুলোক ছিলেন না, এখবর ত জানতুম না। তিনি কোন দুষ্কার্য্য করেছিলেন?'

মহারাজ বলিলেন, 'সাধারণে যাকে দাগী আসামী বলে, সে ছিল তাই। অনেকবার জেল খেটেছিল। শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে যখন আমার কাছে —'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দয়া করে সব কথা গোড়া থেকে বলুন। খবরের কাগজের বিবরণ আমি পড়েছি বটে, কিন্তু তা এত অসম্পূর্ণ যে, কিছুই ধারণা করা যায় না। আপনি মনে করুন, আমরা কিছুই জানি না। সব কথা আপনার মুখে স্পষ্টভাবে শুনলে ব্যাপারটা বোঝবার সুবিধা হবে।'

মহারাজ বলিলেন, 'বেশ তাই বলছি।' তারপর গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'আন্দাজ মাস ছয়েকের কথা হবে; ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হরিপদ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আগের দিন জেল থেকে বেরিয়েছে, আমার কাছে কোন কথাই গোপন করলে না। বললে, আমি যদি তাকে সৎপথে চল্‌বার একটা সুযোগ দিই, তাহলে সে আর বিপথে যাবে না। তাকে দেখে তার কথা শুনে দয়া হ'ল। বয়স বেশী নয়, চল্লিশের নীচেই, কিন্তু এরি মধ্যে বার চারেক জেল খেটেছে। শেষবারে চুরি, জালিয়াতি, নাম ভাঁড়িয়ে পরের দস্তখতে টাকা নেওয়া ইত্যাদি কয়েকটা গুরুতর অপরাধে লম্বা মেয়াদ খেটেছে। দেখলুম অনুতাপও হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ

করতে পার? বললে, লেখাপড়া বেশী শেখবার অবকাশ পাই নি, উনিশ বছর থেকে ক্রমাগত জেলই খাটছি। তবু নিজের চেষ্টায় সর্টহ্যাণ্ড টাইপিং শিখেছি; যদি দয়া করে আপনি নিজের কাছে রাখেন, প্রাণ দিয়ে আপনার কাজ করব।

'হরিপদকে প্রথম দেখেই তার ওপর আমার একটা মায়া জন্মেছিল; কি জানি কেন, ঐ জাতীয় লোকের আবেদন আমি অবহেলা করতে পারি না। তাই যদিও আমার সর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্টের দরকার ছিল না, তবু পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে তাকে নিজের কাছে রাখলুম। তার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। কাছেই একখানা ছোট বাসা ভাড়া করে থাকতে লাগল।

'কিছুদিনের মধ্যেই দেখলুম, লোকটি অসাধারণ কর্ম্মপটু আর বুদ্ধিমান; যে কাজ তার নিজের নয় তাও এমন সুচারুভাবে করে রাখে যে কারুর কিছু বলবার থাকে না। এমন কি, ভবিষ্যতে আমার কি দরকার হবে তা আগে থাকতে আন্দাজ করে তৈরি করে রাখে। মাস দুই যেতে না যেতেই সে আমার কাছে একেবারে অপরিহার্য্য হয়ে উঠল। হরিপদ না হলে কোন কাজই চলে না।

'এই সময় আমার প্রাচীন সেক্রেটারী অবিনাশবাবু মারা গেলেন। আমি তাঁর জায়গায় হরিপদকে নিযুক্ত করলুম। এই নিয়ে আমার আমলাদের মধ্যে একটু মন কষাকষিও হয়েছিল—কিন্তু আমি সে সব গ্রাহ্য করি নি। সব চেয়ে উপযুক্ত লোক বুঝেই হরিপদকে সেক্রেটারীর পদ দিয়েছিলুম।

'তারপর গত চারমাস ধরে হরিপদ খুব দক্ষতার সঙ্গেই সেক্রেটারীর কাজ করে এসেছে, কখনও কোন ত্রুটি হয় নি। নিম্নতন কর্ম্মচারীরা মাঝে মাঝে আমার কাছে তার নামে নালিশ করত, কিন্তু সে সব নিতান্তই

বাজে নালিশ। হরিপদর নামে কলঙ্ক পড়েছিল বটে—জেলের দাগ সহজে মোছে না—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার চরিত্র যে একেবারে বদলে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় অভাবের তাড়নায় সে অসৎপথে গিয়েছিল, তাই অভাব দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্প্রবৃত্তিও কেটে গিয়েছিল। আমাদের জেলখানা খুঁজলে এই ধরণের কত লোক বেরোয় তার সংখ্যা নেই।

'সে যাহোক, হঠাৎ গত মঙ্গলবারে যে ব্যাপার ঘটল তা একেবারে অভাবনীয়। খবরের কাগজে অল্পবিস্তর বিবরণ আপনারা পড়েছেন, তাতে যোগ করবার আমার বিশেষ কিছু নেই। সকাল বেলা খবর পেলুম হরিপদ খুন হয়েছে। পুলিশে খবর পাঠিয়ে নিজে গেলুম তার বাসায়। দেখলুম, শোবার ঘরের মেঝেয় সে মরে পড়ে আছে; রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। হত্যাকারী তার গলাটা এমন ভয়ঙ্কর ভাবে কেটেছে যে ভাবতেও আতঙ্ক হয়। গলার নলী কেটে চিরে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। আপনারা অনেক হত্যাকাণ্ড নিশ্চয় দেখেছেন, কিন্তু এমন পাশবিক নৃশংসতা কখনও দেখেছেন বলে বোধ হয় না।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহারাজ যেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া চক্ষু মুদিলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তার দেহে আর কোথাও আঘাত ছিল না?'

মহারাজ বলিলেন, 'ছিল। তার বুকে ছুরির একটা আঘাত ছিল। ডাক্তার বলেন, ঐ আঘাতই মৃত্যুর কারণ। গলার আঘাতগুলো তার পরের। অর্থাৎ, হত্যাকারী প্রথমে তার বুকে ছুরি মেরে তাকে মর্ম্মান্তিক আহত ক'রে তারপর তার গলা ঐ ভাবে ছিন্নভিন্ন করেছে।

কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা, ভাবুন ত? আমি শুধু ভাবি, কী উন্মত্ত আক্রোশের বশে মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে এমন হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়।'

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। মহারাজ বোধ করি মনুষ্য নামক অদ্ভুত জীবের অমানুষিক দুষ্কৃতি করিবার অফুরন্ত শক্তির কথাই ভাবিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল।

সহসা ব্যোমকেশের অর্দ্ধ-মুদিত চোখের দিকে আমার নজর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম—সেই দৃষ্টি! বহুবার দেখিয়াছি, ভুল হইবার নয়।

ব্যোমকেশ কোথাও একটা সূত্র পাইয়াছে।

মহারাজ অবশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'আমি যা জানি আপনাকে বললুম। এখন আমার ইচ্ছে, পুলিশ যা পারে করুক, সেই সঙ্গে আপনিও আমার পক্ষ থেকে কাজ করুন। এতবড় একটা নৃশংস হত্যাকারী যদি ধরা না পড়ে, তাহলে সমাজের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কথা—আপনার কোন আপত্তি নেই ত?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। পুলিশের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই, বরঞ্চ বিশেষ প্রণয় আছে। আপত্তি কিসের?—আচ্ছা, হরিপদ শেষবার ক'বছর জেল খেটেছিল আপনি জানেন?'

মহারাজা বলিলেন, 'হরিপদর মুখেই শুনেছিলুম, আইনের কয়েক ধারা মিলিয়ে তার চৌদ্দবছর জেল হয়েছিল কিন্তু জেলে শান্তশিষ্ট ভাবে থাকলে কিছু সাজা মাপ হযে থাকে, তাই তাকে এগারো বছরের বেশী খাটতে হয় নি।'

ব্যোমকেশ প্রফুল্লস্বরে বলিল, 'বেশ চমৎকার! হরিপদ সম্বন্ধে আপনি আর কিছু বলতে পারেন না?'

মহারাজ বলিলেন, 'আপনি ঠিক কোন্ ধরণের কথা জানতে চান বলুন, দেখি যদি বলতে পারি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মৃত্যুর দু'চার দিন আগে তার আচার-ব্যবহারে এমন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি, যা ঠিক স্বাভাবিক নয়?'

মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ লক্ষ্য করেছিলুম। মৃত্যুর তিন-চার দিন আগে একদিন সকাল বেলা হরিপদ আমার কাছে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, কোন কারণে সে ভারি ভয় পেয়েছে।'

'সে সময় আর কেউ আপনার কাছে ছিল না?'

মহারাজ একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'সে সময় কতকগুলি ভিক্ষার্থীর আবেদন আমি দেখছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, একজন ভিক্ষার্থী তখন সেখানে উপস্থিত ছিল।'

'তার সামনেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

'হ্যাঁ।'

একটু নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর কিছু? অন্য সময়ের কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণ করতে পারেন না?'

মহারাজ প্রায় পাঁচ মিনিট গালে হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'একটা সামান্য কথা মনে পড়ছে। নিতান্তই অবান্তর ঘটনা, তবু বলছি আপনার যদি সাহায্য হয়। আপনি বোধ হয় জানেন না, কয়েক বছর আগে আমার বাড়ী থেকে একটা দামী নীলা চুরি যায়—'

'জানি বৈকি।'

'জানেন? তাহলে এও নিশ্চয় জানেন যে, সেই নীলাটা ফিরে পাবার জন্যে আমি দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলুম?'

'তাও জানি। তবে সে ঘোষণা এখনও বলবৎ আছে কিনা জানি না।'

মহারাজ বলিলেন, 'ঠিক ঐ প্রশ্নই হরিপদ করেছিল। তখন সে আমার টাইপিষ্ট, সবে মাত্র কাজে ঢুকেছে। এক দিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'মহারাজ, আপনার যে নীলাটা চুরি গিয়েছিল, সেটা এখন ফিরে পেলে কি আপনি দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন?' তার প্রশ্নে কিছু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম; কারণ এতদিন পরে নীলা ফিরে পাবার আর কোনও আশাই ছিল না, পুলিশ আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল।'

'আপনি হরিপদর প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিলেন?'

'বলেছিলুম, যদি নীলা ফিরে পাই নিশ্চয়ই দেব।'

ব্যোমকেশ তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি যদি আজ ঐ প্রশ্ন করি, তাহলে কি সেই উত্তরই দেবেন?'

মহারাজ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ নিশ্চয়। কিন্তু—?'

ব্যোমকেশ আবার বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'আপনি হরিপদর হত্যাকারীর নাম জানতে চান?'

মহারাজের হতবুদ্ধি ভাব আরও বর্দ্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, 'আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি হরিপদর হত্যাকারীর নাম জানেন নাকি?'

'জানি, তবে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা আমার কাজ নয়—সে কাজ পুলিশ করুক। আমি শুধু তার নাম বলে দেব; তারপর তার বাড়ী তল্লাস করে প্রমাণ বার করা বোধ হয় শক্ত হবে না।'

অভিভূত কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন, 'কিন্তু এ যে ভেল্কিবাজির মত মনে হচ্ছে। সত্যিই আপনি তার নাম জানেন? কি করে জানলেন?'

'আপাতত অনুমান মাত্র। তবে অনুমান মিথ্যে হবে না। হত্যাকারীর নাম হচ্ছে—রমানাথ নিয়োগী।'

'রমানাথ নিয়োগী! কিন্তু—কিন্তু নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'হবারই ত কথা। বছর দশেক আগে ইনিই আপনার নীলা চুরি করে জেলে গিয়েছিলেন, সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়েছেন!'

'মনে পড়েছে। কিন্তু সে হরিপদকে খুন করলে কেন? হরিপদর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?'

'সম্বন্ধ আছে—পুরোনো কয়েকটা নথি ঘাঁটলেই সেটা বেরুবে। কিন্তু মহারাজ, বেলা প্রায় এগারটা বাজে, আর আপনাকে ধরে রাখব না। বিকেলে চারটের সময় যদি দয়া করে আবার পায়ের ধূলো দেন তা হলে সব কথা জানতে পারবেন। আর হয়ত নীলাটাও ফিরে পেতে পারেন। আমি ইতিমধ্যে সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

২

হতভম্ব মহারাজকে বিদায় দিয়া ব্যোমকেশ নিজেও বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত বেলায় তুমি আবার কোথায় চললে?'

সে বলিল, 'বেরুতে হবে। জেলের কিছু পুরোনো কাগজপত্র দেখা দরকার! তা ছাড়া অন্য কাজও আছে। কখন ফিরব কিছু ঠিক নেই। যদি সময় পাই, হোটেলে খেয়ে নেব।' বলিয়া ছাতা ও বর্ষাতি লইয়া বিরামহীন বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

যখন ফিরিয়া আসিল তখন বেলা তিনটা। জামা, জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল, 'বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়া হয় নি। স্নান

করে নিই। পুঁটিরাম, চট্ করে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা কর।—আজ ম্যাটিনে—ঠিক চারটের সময় অভিনয় আরম্ভ হবে।'

বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'সে কি! কিসের অভিনয়?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'ভয় নেই—এই ঘরেই অভিনয় হবে। অজিত, দর্শকদের জন্যে আরও গোটাকয়েক চেয়ার এ ঘরে আনিয়ে রাখ।' বলিয়া স্নান-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

স্নানান্তে আহার করিতে বসিলে বলিলাম, 'সমস্ত দিন কি করলে বল!'

ব্যোমকেশ অনেকখানি অমলেট্ মুখে পুরিয়া দিয়া পরম তৃপ্তির সহিত চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'জেল ডিপার্টমেণ্টের অফিসে আমার এক বন্ধু আছেন প্রথমে তাঁর কাছে গেলুম। সেখানে পুরোনো রেকর্ড বার করে দেখা গেল যে, আমার অনুমান ভুল হয় নি।'

'তোমার অনুমানটা কি?'

প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'সেখানকার কাজ শেষ করে বুদ্ধুবাবু—থুড়ি—বিধুবাবুর কাছে গেলুম। হরিপদর খুনটা তাঁরই এলাকায় পড়ে। কেসের ইন্‌চার্জ্জ হচ্ছেন ইন্সপেক্টর পূর্ণবাবু। পূর্ণবাবুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে এবং বিধুবাবুর পদদ্বয়ে যথোচিত তৈল প্রয়োগ করে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যোদ্ধার হল।'

'কিন্তু কার্য্যটা কি তাই যে আমি এখনও জানি না।'

'কার্য্যটা হচ্ছে প্রথমত রমানাথ নিয়োগীর ঠিকানা বার করা এবং দ্বিতীয়ত তাকে গ্রেপ্তার করে তার বাসা খানাতল্লাস করা। ঠিকানা সহজেই বেরুল, কিন্তু খানাতল্লাসে বিশেষ ফল হল না। অবশ্য রমানাথের ঘর থেকে একটা ভীষণাকৃতি ছোরা বেরিয়েছে; তাতে মানুষের রক্ত পাওয়া যায় কি না পরীক্ষার জন্যে পাঠান হয়েছে। কিন্তু যে জিনিস পাব

আশা করেছিলুম তা পেলুম না। লোকটার লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা অসামান্য।'

'কি জিনিস?'

'মহারাজের নীলাটা!'

'তারপর? এখন কি করবে?'

'এখন অভিনয় করব। রমানাথের কুসংস্কারে ঘা দিয়ে দেখব যদি কিছু ফল পাই—ঐ বোধ হয় মহারাজ এলেন। বাকি অভিনেতারাও এসে পড়ল বলে।' বলিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইল।

'আর কারা আসবে?'

'রমানাথ এবং তার রক্ষীরা।'

'তারা এখানে আসবে?'

'হ্যাঁ, বিধুবাবুর সঙ্গে সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছে।—পুঁটিরাম, খাবারের বাসনগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলাম না, মহারাজ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া চারটে বাজিল। দেখিলাম, মহারাজ রাজোচিত শিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন।

মহারাজকে সমাদর করিয়া বসাইতে না বসাইতে আরও কয়েকজনের পদশব্দ শুনা গেল। পরক্ষণেই বিধুবাবু, পূর্ণবাবু ও আরও দুইজন সব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রমানাথ প্রবেশ করিল।

রমানাথের চেহারার এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে; চুরি বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে বোধহয় চেহারাটি নিতান্ত চলনসই হওয়া দরকার। রমানাথের মাথায় ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, কপাল অপরিসর, চিবুক ছুঁচালো—চোখে সতর্ক চঞ্চলতা। তাহার গায়ে বহু বৎসরের পুরাতন (সম্ভবত জেলে যাইবার আগেকার) চামড়ার বোতাম

আঁটা পাঁচ মিশালি রঙের স্পোর্টিং কোট ও পায়ে অপ্রত্যাশিত একজোড়া রবারের বুট জুতা, দেখিয়া সহসা হাস্যরসের উদ্রেক হয়! ইনি যে একজন সাংঘাতিক ব্যক্তি সে সন্দেহ কাহারও মনে উদয় হয় না।

ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহাকে দেখাইয়া বলিল, 'মহারাজ, লোকটিকে চিনতে পারেন কি?'

মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখন চিনতে পারছি। এই লোকটাই সেদিন ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল।'

'বেশ। এখন তাহলে আপনারা সকলে আসন গ্রহণ করুন। বিধুবাবু, মহারাজের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে। আসুন, আপনি মহারাজের পাশে বসুন। রমানাথ, তুমি এইখানে বস।' বলিয়া ব্যোমকেশ রমানাথকে টেবিলের ধারে একটা চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

রমানাথ বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া উপবেশন করিল। দুই জন সব-ইন্সপেক্টর তাহার দুই পাশে বসিলেন। বিধুবাবু অভ্রভেদী গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কট্‌মট্ করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। এই সম্পূর্ণ আইন-বিগর্হিত ব্যাপার ঘটিতে দিয়া তিনি যে ভিতরে ভিতরে অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সকলে উপবিষ্ট হইলে ব্যোমকেশ টেবলের সম্মুখে বসিল। বলিল, 'আজ আমি আপনাদের একটা গল্প বলব। অজিতের গল্পের মত কাল্পনিক গল্প নয়—সত্য ঘটনা। যতদূর সম্ভব নির্ভুল ভাবেই বলবার চেষ্টা করব; যদি কোথাও ভুল হয়, রমানাথ সংশোধন করে দিতে পারবে। রমানাথ ছাড়া আর একজন এ কাহিনী জান্‌ত, কিন্তু আজ সে বেঁচে নেই।'

এতটুকু ভূমিকা করিয়া ব্যোমকেশ তাহার গল্প আরম্ভ করিল। রমানাথের মুখ কিন্তু নির্ব্বিকার হইয়া রহিল। সে মুখ তুলিল না, একটা

কথা বলিল না, নির্লিপ্তভাবে আঙুল দিয়া টেবলের উপর দাগ কাটিতে লাগিল।

'রমানাথ জেলে যাবার পর থেকেই গল্প আরম্ভ করছি। রমানাথ জেলে গেল, কিন্তু মহারাজের নীলাটা সে কাছছাড়া করলে না, সঙ্গে করে নিয়ে গেল। কি কৌশলে সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়ে গেল—তা আমি জানি না, জানবার চেষ্টাও করি নি। রমানাথ ইচ্ছে করলে বলতে পারে।

পলকের জন্য রমানাথ ব্যোমকেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই আবার নিবিষ্ট মনে টেবলে দাগ কাটিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'রমানাথ অনেক ভাল ভাল দামী জহরৎ চুরি করেছিল; কিন্তু তার মধ্যে থেকে কেবল মহারাজের রক্তমুখী নীলাটাই যে কেন সঙ্গে রেখেছিল তা অনুমান করাই দুষ্কর। সম্ভবত পাথরটার একটা সম্মোহন শক্তি ছিল; জিনিসটা দেখতেও চমৎকার--গাঢ় নীল রঙের একটা হীরা, তার ভেতর থেকে রক্তের মত লাল রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। রমানাথ সেটাকে সঙ্গে নেবার লোভ সামলাতে পারে নি। পাথরটা খুব পয়মন্ত একথাও সম্ভবত রমানাথ শুনেছিল। দুর্নিয়তি যখন মানুষের সঙ্গ নেয়, তখন মানুষ তাকে বন্ধু বলেই ভুল করে।

'যাহোক, রমানাথ আলিপুর জেলে রইল। কিছুদিন পরে পুলিশ জানতে পারলে যে, নীলাটা তার কাছেই আছে। যথাসময়ে রমানাথের 'সেল' খানাতল্লাস হল। রমানাথের 'সেলে' আর একজন কয়েদী ছিল, তাকেও সার্চ্চ করা হল। কিন্তু নীলা পাওয়া গেল না। কোথায় গেল নীলাটা?

'রমানাথের সেলে যে দ্বিতীয় কয়েদী ছিল তার নাম হরিপদ রক্ষিত। হরিপদ পুরোনো দাগী আসামী, ছেলেবেলা থেকে জেল খেটেছে—তার

অনেক গুণ ছিল। যাঁরা জেলের কয়েদী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তাঁরাই জানেন, এক জাতীয় কয়েদী আছে যারা নিজেদের গলার মধ্যে পকেট তৈরি করে। ব্যাপারটা শুনতে খুবই আশ্চর্য্য কিন্তু মিথ্যে নয়। কয়েদীরা টাকাকড়ি জেলে নিয়ে যেতে পারে না; অথচ তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই নেশাখোর। তাই, ওয়ার্ডারদের ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে মাদকদ্রব্য আনাবার জন্যে টাকার দরকার হয়। গলায় পকেট তৈরি করবার ফন্দি এই প্রয়োজন থেকেই উৎপন্ন হয়েছে; যারা কাঁচা বয়স থেকে জেলে আছে তাদের মধ্যেই এ জিনিসটা বেশী দেখা যায়। প্রবীণ পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রেই এসব কথা জানেন।

'হরিপদ ছেলেবেলা থেকে জেল খাটছে, সে নিজের গলায় পকেট তৈরি করেছিল। রমানাথ যখন তার সেলে গিয়ে রইল তখন দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল। ক্রমে হরিপদর পকেটের কথা রমানাথ জানতে পারলে।

তারপর একদিন হঠাৎ পুলিশ জেলে হানা দিলে। সেলের মধ্যে নীলা লুকোবার জায়গা নেই; রমানাথ নীলাটা হরিপদকে দিয়ে বললে, তুমি এখন গলার মধ্যে লুকিয়ে রাখ। হরিপদকে সে নীলাটা আগেই দেখিয়েছিল এবং হরিপদরও সেটার উপর দারুণ লোভ জন্মেছিল। সে নীলাটা নিয়েই টপ করে গিলে ফেললে: তার কণ্ঠনলীর মধ্যে নীলাটা গিয়ে রইল। বলা বাহুল্য, পুলিশ এসে যখন তল্লাস করলে তখন কিছুই পেলে না।

'এই ঘটনার পরদিনই হরিপদ হঠাৎ অন্য জেলে চালান হয়ে গেল, জেলের রেকর্ডে তার উল্লেখ আছে। হরিপদর ভারি সুবিধা হল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করলে—যাবার আগে নীলাটা রমানাথকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল না। রমানাথ কিছু বলতে পারলে না—চোরের মা'র কান্না কেউ

শুনতে পায় না—সে মন গুমরে রয়ে গেল। মনে মনে তখন থেকেই বোধ করি ভীষণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্প আঁটতে লাগল।'

এই সময় লক্ষ্য করিলাম, রমানাথের মুখের কোন বিকার ঘটে নাই বটে, কিন্তু রগ ও গলার শিরা দপ্ দপ্ করিতেছে, দুই চক্ষু রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিয়া চলিল, "তারপর একে একে দশটি বছর কেটে গেছে। ছ'মাস আগে হরিপদ জেল থেকে মুক্তি পেল। মুক্তি পেয়েই সে মহারাজের কাছে এল। তার ইচ্ছে ছিল মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ক্রমে নীলাটা তাঁকে ফেরৎ দেবে। বিনামূল্যে নয়—দুহাজার টাকা পুরস্কারের কথা সে জানত। ও নীলা অন্যত্র বিক্রী করতে গেলেই ধরা পড়ে যেতে হবে, তাই সে-চেষ্টাও সে করলে না।

'কিন্তু প্রথম থেকেই মহারাজ তার প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করলেন যে, সে ভারি লজ্জায় পড়ে গেল। তবু সে একবার নীলার কথা মহারাজের কাছে তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নীলার বদলে মহারাজের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে তার বিবেকে বেধে গেল। মহারাজের দয়ার গুণে হরিপদর মত লোকের মনেও যে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছিল, এটা বড় কম কথা নয়।

'ক্রমে হরিপদর দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। দশদিন আগে রমানাথ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরুল। হরিপদ কোথায় তা সে জানত না, কিন্তু এমনি দৈবের খেলা যে, চারদিন যেতে না যেতেই মহারাজের বাড়ীতে রমানাথ তার দেখা পেয়ে গেল। রমানাথকে দেখার ফলেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়বার তার আর কোনও কারণ ছিল না।

'যে প্রতিহিংসার আগুন দশ বছর ধরে রমানাথের বুকে ধিকি ধিকি

জ্বলছিল, তা একেবারে দুর্ব্বার হয়ে উঠল। হরিপদর বাড়ীর সন্ধান সে সহজেই বার করলে। তারপর সেদিন রাত্রে গিয়ে—'

এ পর্য্যন্ত ব্যোমকেশ সকলের দিকে ফিরিয়া গল্প বলিতেছিল, এখন বিদ্যুতের মত রমানাথের দিকে ফিরিল। রমানাথও মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নিষ্পলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া ছিল; ব্যোমকেশ তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চাপা তীব্র স্বরে বলিল, 'রমানাথ, সে রাত্রে হরিপদর গলা ছিঁড়ে তার কণ্ঠনালীর ভেতর থেকে তুমি নীলা বার করে নিয়েছিলে। সে নীলা কোথায়?'

রমানাথ ব্যোমকেশের চক্ষু হইতে চক্ষু সরাইতে পারিল না। সে একবার জিহ্বা দ্বারা অধর লেহন করিল, একবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, তারপর যেন অসীম বলে নিজেকে ব্যোমকেশের সম্মোহন দৃষ্টির নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমি, আমি জানি না—হরিপদকে আমি খুন করি নি—হরিপদ কার নাম আমি জানি না। নীলা আমার কাছে নেই—' বলিয়া আরক্ত বিদ্রোহী চক্ষে চাহিয়া সে দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

ব্যোমকেশের অঙ্গুলি তখনও তাহার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া ছিল। আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন একটা মর্ম্মগ্রাসী নাটকের অভিনয় দেখিতেছি, দুইটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি পরস্পরের সহিত মরণান্তক যুদ্ধ করিতেছে; শেষ পর্য্যন্ত কে জয়ী হইবে তাহা দেখিবার একাগ্র আগ্রহে আমরা চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বরে একটা ভয়ঙ্কর দৈববাণীর সুর ঘনাইয়া আসিল; সে রমানাথের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পূর্ব্ববৎ তীব্র অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'রমানাথ, তুমি জানো না কী ভয়ানক অভিশপ্ত ওই রক্তমুখী নীলা! তাই ওর মোহ কাটাতে পারছ না। ভেবে দ্যাখ, যতদিন তুমি ঐ নীলা

চুরি না করেছিলে, ততদিন তোমাকে কেউ ধরতে পারে নি—নীলা চুরি করেই তুমি জেলে গেলে। তারপর হরিপদর পরিণামটাও একবার ভেবে ছাখ। সে গলার মধ্যে নীলা লুকিয়ে রেখেছিল, তার গলার কী অবস্থা হয়েছিল তা তোমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। এখনও যদি নিজের ইষ্ট চাও, ঐ সর্ব্বনাশা নীলা ফেরত দাও। নীলা নয়—ও কেউটে সাপের বিষ। যদি হাতে সে নীলা পর, তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে; যদি গলায় পর, ঐ নীলা ফাঁসির দড়ি হয়ে তোমার গলা চেপে ধরবে।'

অব্যক্ত একটা শব্দ করিয়া রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনের ভিতর কিরূপ প্রবল আবেগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমরাও সম্যক বুঝিতে পারি নাই। পাগলের মত সে একবার চারিদিকে তাকাইল, তারপর নিজের কোটের চামড়ার বোতামটা সজোরে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'চাই না—চাই না! এই নাও নীলা, আমাকে বাঁচাও!!' বলিয়া একটা দীর্ঘ শিহরিত নিশ্বাস ফেলিয়া অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

ব্যোমকেশ কপাল হইতে ঘাম মুছিল। দেখিলাম তাহার হাত কাঁপিতেছে—ইচ্ছাশক্তির যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু অবলীলা-ক্রমে নয়।

রমানাথের নিক্ষিপ্ত বোতামটা ঘরের কোণে গিয়া পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া তাহার খোলস ছাড়াইতে ছাড়াইতে ব্যোমকেশ স্খলিত-স্বরে বলিল, 'মহারাজ, এই নিন আপনার রক্তমুখী নীলা।'

অগ্নিবাণ

১

খবরের কাগজখানা হতাশ হস্ত-সঞ্চালনে আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'নাঃ—কোথাও কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। এর চেয়ে কাগজওয়ালারা সাদা কাগজ বের করলেই পারে। তাতে ছাপার খরচটা অন্ততঃ বেঁচে যায়।'

আমি খোঁচা দিয়া বলিলাম, 'বিজ্ঞাপনেও কিছু পেলে না? বল কি? তোমার মতে ত দুনিয়ার যত কিছু খবর সব ঐ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের মধ্যেই ঠাসা আছে।'

বিমর্ষ-মুখে চুরুট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না, বিজ্ঞাপনেও কিছু নেই। একটা লোক বিধবা-বিয়ে করতে চায় ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কুমারী ছেড়ে বিধবা বিয়ে করবার জন্যেই গো ধরেছে কেন, ঠিক বোঝা গেল না। নিশ্চয় কোনও বদ্ মৎলব আছে।'

'তা ত বটেই। আর কিছু?'

'আর, একটা বীমা কোম্পানী মহা ঘটা ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর জীবন এক সঙ্গে বীমা করবে, এবং জোড়ার মধ্যে একটাকে কোনও রকমে পটল তোলাতে পারলেই অন্য জন টাকা পাবে। এই সব বীমা কোম্পানী এমন ক'রে তুলেছে যে, মরেও সুখ নেই।'

'কেন, এর মধ্যেও বদ্ মৎলব আছে নাকি?'

'বীমা কোম্পানীর নিজের স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের মনে দুর্ব্বুদ্ধি জাগিয়ে তোলাও সৎকার্য্য নয়।'

'অর্থাৎ? মানে হল কি?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হৃদয়ভারাক্রান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া টেবলের উপর পা তুলিয়া দিল, তার পর কড়িকাঠের দিকে অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে ধূম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল।

শীতকাল; বড়দিনের ছুটী চলিতেছিল। কলিকাতার লোক বাহিরে গিয়া ও বাহিরের লোক কলিকাতায় আসিয়া মহা সমারোহে ছুটী উদ্‌যাপন করিতেছিল। কয়েক বছর আগেকার কথা, তখন ব্যোমকেশের বিবাহ হয় নাই।

আমরা দুই জনে চিরন্তন অভ্যাসমত সকালে উঠিয়া একত্র চা-পান ও সংবাদপত্রের ব্যবচ্ছেদ করিতেছিলাম। গত তিন মাস একবারে বেকারভাবে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের ধৈর্য্যের লৌহ-শৃঙ্খলও বোধ করি ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। দিনের পর দিন সংবাদপত্রের নিষ্প্রাণ ও বৈচিত্র্যহীন পৃষ্ঠা হইতে অপদার্থ খবর সংগ্রহ করিয়া সময় আর কাটিতে চাহিতেছিল না। আমার নিজের মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতেছিলাম, ব্যোমকেশের মস্তিষ্কের ক্ষুধা ইন্ধন অভাবে কিরূপ উগ্র ও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি নাই; বরঞ্চ এই অনীপ্সিত নৈষ্কর্ম্মের জন্য যেন সে-ই মূলতঃ দায়ী, এমনিভাবে তাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছি।

আজ প্রভাতে তাহার এই হতাশাপূর্ণ ভাব দেখিয়া আমার একটু অনুশোচনা হইল। মস্তিষ্কের খোরাক সহসা বন্ধ হইয়া গেলে সুস্থ বলবান মস্তিষ্কের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা ত জানিই, উপরন্তু আবার বন্ধুর খোঁচা খাইতে হইলে ব্যাপারটা নিতান্তই নিষ্করুণ হইয়া পড়ে।

আমি আর কাহাকে প্রশ্ন না করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে খবরের কাগজখানা খুলিলাম।

এই সময়ে চারিদিকে সভাসমিতি ও অধিবেশনের ধূম পড়িয়া যায়, এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সংবাদ-ব্যবসায়ীরা সরসতর সংবাদের অভাবে এই সব সভার মামুলি বিবরণ ছাপিয়া পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা ও থিয়েটার-সার্কাসের বিজ্ঞাপন সচিত্র ও বিচিত্ররূপে আমোদ-লোলুপ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

দেখিলাম, কলিকাতাতেই গোটা পাঁচেক বড় বড় সভা চলিতেছে। তা ছাড়া দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার অধিবেশন বসিয়াছে। ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে অনেক হোমরা-চোমরা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একজোট হইয়াছেন এবং বাক্যধূমে বোধ করি দিল্লীর আকাশ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সংবাদপত্রের মারফৎ যতটুকু ধূম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারই ঠেলায় মস্তিষ্ক কোটরে ঝুল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

আমি সময় সময় ভাবি, আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা কাজ না করিয়া এত বাগ্‌বিস্তার করেন কেন? দেখিতে পাই, যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি তার চতুর্গুণ বাগ্মী। বেশী কিছু নয়, ষ্টীম এঞ্জিন বা এরোপ্লেনের মত একটা যন্ত্রও যদি ইহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের বাচালতা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতাম। কিন্তু ও সব দূরে থাক মশা মারিবার একটা বিষও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বুজরুকি আর কাহাকে বলে!

নিরুৎসুকভাবে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিবরণ পড়িতে পড়িতে একটা নাম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইনি কলিকাতার একজন খ্যাতনামা প্রফেসার ও বিজ্ঞান-গবেষক—নাম দেবকুমার সরকার। বিজ্ঞান-সভায় ইনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। অবশ্য ইনি ছাড়া অন্য কোনও বাঙালী যে বক্তৃতা দেন নাই, এমন নয়, অনেকেই দিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া দেবকুমার-বাবুর নামটা চোখে পড়িবার কারণ, কলিকাতায় তিনি আমাদের

প্রতিবেশী, আমাদের বাসার কয়েকখানা বাড়ীর পরে গলির মুখে তাঁহার বাসা। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁহার পুত্র হাবুলের সম্পর্কে আমরা তাঁহার সহিত নেপথ্য হইতেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুল কিছুদিন হইতে ব্যোমকেশের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোকরার বয়স আঠারো উনিশ, কলেজের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। ভালমানুষ ছেলে, আমাদের সম্মুখে বেশী কথা বলিতে পারিত না, তদ্‌গতভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া এই অস্ফুটবাক্‌ ভক্তের পূজা গ্রহণ করিত; কখনও চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিত। হাবুল একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইত।

এই হাবুলের পিতা কিরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হইল। পড়িয়া দেখিলাম, দেশী বৈজ্ঞানিকদের অভাব অসুবিধার সম্বন্ধে ভদ্রলোক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নেহাৎ মিথ্যা নয়। ব্যোমকেশকে পড়িয়া শুনাইলে তাহার মনটা বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হইয়া হয়ত একটু প্রফুল্ল হইতে পারে, তাই বলিলাম, 'ওহে, হাবুলের বাবা দেবকুমারবাবু বক্তৃতা দিয়েছেন শোনো।'

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইল না, বিশেষ ঔৎসুক্যও প্রকাশ করিল না। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

'এ কথা সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও জাতি বড় হইতে পারে নাই। অনেকের ধারণা এইরূপ যে, ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরাঙ্মুখ এবং তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি নাই—এই জন্যই ভারত পরনির্ভর ও পরাধীন হইয়া আছে। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, ভারতের গরিমাময় অতীত তাহার প্রমাণ। নব্য-বিজ্ঞানের

যাহা বীজমন্ত্র, তাহা যে ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও পরে কাশপুষ্পের বীজের ন্যায় বায়ুতাড়িত হইয়া দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা এই সুধীসমাজে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। গণিত, জ্যোতিষ, নিদান, স্থাপত্য—এই চতুস্তম্ভের উপর আধুনিক বিজ্ঞান ও তৎপ্রসূত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, অথচ ঐ চারিটি বিজ্ঞানেরই জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

'কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্ত্তমানে আমাদের এই অসামান্য উদ্ভাবনী প্রতিভা নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? আমরা কি মানসিক বলে পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িযাছি? না—তাহা নহে। আমাদের প্রতিভা অ-ফলপ্রসূ হইবার অন্য কারণ আছে।

'পুরাকালে আচার্য্য ও ঋষিগণ—যাঁহাদের বর্ত্তমানকালে আমরা savant বলিয়া থাকি—রাজ-অনুগ্রহের আওতায় বসিয়া সাধনা করিতেন। অর্থচিন্তা তাঁহাদের ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে রাজা সে অর্থ যোগাইতেন; সাধনার সাফল্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, রাজ-কোষের অসীম ঐশ্বর্য্য তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দিত। আচার্য্যগণ অভাবমুক্ত হইয়া কুণ্ঠাহীন-চিত্তে সাধনা করিতেন এবং অন্তিমে সিদ্ধি লাভ করিতেন।

'কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অবস্থা কিরূপ? রাজা বৈজ্ঞানিক-গবেষণার পরিপোষক নহেন—ধনী ব্যক্তিরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমিত আয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; ফলে আমাদের সিদ্ধিও তদুপযুক্ত হইয়া থাকে। মূষিক যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হস্তীকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে না, আমরাও তেমনই বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ায় সফল হইতে পারি না; ক্ষুধাক্ষীণ মস্তিষ্ক বৃহত্তের ধারণা করিতে পারে না।

'তবু আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, যদি আমরা অর্থের অভাবে পীড়িত না হইয়া অকুণ্ঠ-চিত্তে সাধনা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা জগতের কোনও জাতির নিকটেই ন্যূন হইয়া থাকিতাম না। কিন্তু হায়! অর্থ নাই—কমলার কৃপার অভাবে আমাদের বাণীর সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তবু, এই দৈন্য-নির্জ্জিত অবস্থাতেও আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা নিন্দার বিষয় নহে—শ্লাঘার বিষয়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ল্যাবরেটারিতে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া মাঝে মাঝে অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া আবিষ্কর্ত্তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? আবিষ্কারক নিজের গোপন আবিষ্কার সযত্নে বুকে লুকাইয়া নীরবে আরও অধিক জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরিতেছে; কিন্তু সে একাকী, তাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই; বরঞ্চ সর্ব্বদাই ভয়, অন্য কেহ তাহার আবিষ্কার-কণিকার সন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা আত্মসাৎ করিবে। লোলুপ পরস্বগৃধ্নু চোরের দল চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

'তাই বলিতেছি—অর্থ চাই, সহানুভূতি চাই, গবেষণা করিবার অবাধ অফুরন্ত উপকরণ চাই, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে নিষ্কণ্টকে যশোলাভের নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা চাই। অর্থ চাই—'

'থামো।'

প্রফেসার মহাশয়ের ভাবাটি বেশ গাল-ভরা, তাই শব্দপ্রবাহে গা ভাসাইয়া পড়িয়া চলিয়াছিলাম। হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'থামো।'

'কি হ'ল?'

'চাই--চাই—চাই। আর আস্ফালন ভাল লাগে না। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর।'

আমি বলিলাম, 'ঐ ত মজা। মানুষ নিজের অক্ষমতার একটা-না-একটা সাফাই সর্ব্বদাই তৈরী ক'রে রাখে। আমাদের দেশের আচার্য্যরাও যে তার ব্যতিক্রম নয়, দেবকুমারবাবুর লেকচার পড়লেই তা বোঝা যায়।'

ব্যোমকেশের মুখের বিরক্তি ও অবসাদ ভেদ করিয়া একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'হাবুল ছোকরা দেখতে হাবাগোবা ভালমানুষ হলেও ভেতরে ভেতরে বেশ বুদ্ধিমান। তার বাবা হয়ে দেবকুমারবাবু এমন ইঁযের মত আদি-অন্তহীন বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান কেন, এই আশ্চর্য্য!'

আমি বলিলাম, 'বুদ্ধিমান ছেলের বাবা হলেই বুদ্ধিমান হ'তে হবে, এমন কোনও কথা নেই। দেবকুমারবাবুকে তুমি দেখেছ?'

'ঠিক বলতে পারি না। তাঁকে দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কখনও প্রাণে জাগে নি। তবে শুনেছি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছেন। নির্ব্বুদ্ধিতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?' বলিয়া ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে চক্ষু মুদিল।

ঘড়ীতে সাড়ে আটটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া শেষে পুঁটিরামকে আর এক দফা চা ফরমাস দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।' কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আবার ঠেসান দিয়া বসিয়া বিরস স্বরে বলিল, 'হাবুল। তার আবার কি হ'ল? বড্ড তাড়াতাড়ি আসছে।'

মুহূর্ত্ত পরেই হাবুল সজোরে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটা যেন ভয়ে ও অভাবনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার আঘাতে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এমনিতেই

তাহার চেহারাখানা খুব সুদর্শন নয়, একটু মোটাসোটা ধরণের গড়ন, মুখ গোলাকার, চিবুক ও গণ্ডে নবজাত দাড়ির অন্ধকার ছায়া— তাহার উপর এই পাগলের মত আবির্ভাব; আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, 'কি হে হাবুল! কি হয়েছে?'

হাবুলের পাগলের মত দৃষ্টি কিন্তু ব্যোমকেশের উপর নিবদ্ধ ছিল; আমার প্রশ্ন বোধ করি সে শুনিতেই পাইল না, টলিতে টলিতে ব্যোমকেশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'ব্যোমকেশদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার বোন রেণু হঠাৎ মরে গেছে।' বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

২

ব্যোমকেশ হাবুলকে হাত ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ তাহাকে শান্ত করা গেল না, সে অসহায়ভাবে কাঁদিতেই লাগিল। বেচারার বয়স বেশী নয়, বালক বলিলেই হয়; তাহার উপর অকস্মাৎ এই দারুণ ঘটনায় একবারে উদ্‌ভ্রান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হাবুলের যে বোন আছে, এ খবর আমরা জানিতাম না; তাহার পারিবারিক খুঁটিনাটি জানিবার কৌতূহল কোনও দিন হয় নাই। শুধু এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে, হাবুলের মাতার মৃত্যুর পর দেবকুমারবাবু আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতাটি সপত্নীপুত্রকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, ইহাও আঁচে-আন্দাজে বুঝিয়াছিলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়া হাবুল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। দেবকুমারবাবু কয়েক দিন হইল দিল্লী গিয়াছেন; বাড়ীতে

হাবুল, তাহার অনূঢ়া ছোট বোন রেখা ও তাহাদের সৎমা আছেন। আজ সকালে উঠিয়া হাবুল যথারীতি নিজের তে-তলার নিভৃত ঘরে পড়িতে বসিয়াছিল; আটটা বাজিয়া যাইবার পর নীচে হঠাৎ সৎমার কণ্ঠে ভীষণ চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল; দেখিল, সৎমা রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধস্বরে প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার প্রলাপের কোনও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হাবুল রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বোন রেখা উনানের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। কি হইয়াছে, জানিবার জন্য হাবুল তাহাকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রেখা উত্তর দিল না। তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেই হাবুল বুঝিল, রেখা নাই, তাহার গা বরফের মত ঠাণ্ডা, হাত-পা ক্রমশঃ শক্ত হইয়া আসিতেছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাবুল আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমি এখন কি করব, ব্যোমকেশদা? বাবা বাড়ী নেই, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম। রেখা ম'রে গিয়েছে—উঃ! কি ক'রে এমন হ'ল, ব্যোমকেশদা?'

হাবুলের এই শোক-বিহ্বল ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। ব্যোমকেশ হাবুলের পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'হাবুল, তুমি পুরুষমানুষ, বিপদে অধীর হয়ো না। কি হয়েছিল রেখার, বল দেখি—বুকের ব্যামো ছিল কি?'

'তা ত জানি না।'

'কত বয়স?'

'ষোলো বছর, আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট।'

'সম্প্রতি কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছিল? বেরিবেরি বা ঐ রকম কিছু?'

'না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তার পর বলিল, 'চল

তোমার বাড়ীতে। নিজের চোখে না দেখলে কিছুই ধারণা করা যাচ্ছে না। তোমার বাবাকে 'তার' করা দরকার, তিনি এসে পড়ুন। কিন্তু সে দু'ঘণ্টা পরে করলেও চলবে। আপাততঃ একজন ডাক্তার চাই। তোমার বাড়ীর কাছেই ডাক্তার রুদ্র থাকেন না? বেশ—এস অজিত।'

কয়েক মিনিট পরে দেবকুমারবাবুর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীখানার সম্মুখভাগ সঙ্কীর্ণ, যেন দুই দিকের বাড়ীর চাপে চ্যাপ্টা হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গিয়াছে। নীচের তলায় কেবল একটি বসিবার ঘর, তা ছাড়া ভিতরদিকে কলঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি আছে। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইতেই অন্দর হইতে একটা তীক্ষ্ণ স্ত্রীকণ্ঠের ছেদ-বিরামহীন আওয়াজ কানে আসিল। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও শোকের লক্ষণ বিশেষ পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, বিমাতা বিলাপ করিতেছেন।

একটা বৃদ্ধ গোছের ভৃত্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'তুমি এ বাড়ীর চাকর? যাও, ঐ বাড়ী থেকে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।'

চাকরটা কিছু একটা করিবার সুযোগ পাইয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। তখন হাবুলকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

যাঁহার কণ্ঠস্বর বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তিনি উপরে উঠিবার সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একাকী অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিলেন, আমাদের পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙিল; তিনি উচ্চকিতভাবে আমাদের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত লোককে হাবুলের সঙ্গে দেখিয়া তিনি মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। আমি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখখানা দেখিতে পাইয়াছিলাম।

আমার মনে হইল, তাঁহার আরক্ত চোখের ভিতর একটা ত্রাস-মিশ্রিত বিরক্তির ছায়া দেখা দিয়াই অঞ্চলের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

হাবুল অস্ফুটস্বরে বলিল, 'আমার মা—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। রান্নাঘর কোন্‌টা ?'

হাবুল অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। অল্পপরিসর চতুষ্কোণ উঠান ঘিরিয়া ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ ; তাহার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেইটি রান্নাঘর। পাশে একটি জলের কল, তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জল পড়িয়া দ্বারের সম্মুখভাগ পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছে।

জুতা খুলিয়া আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, আলোক-প্রবেশের কোনও পথ নাই। হাবুল দরজার পাশে হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিতেই একটা ধোঁয়াটে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলিয়া উঠিল। তখন ঘরের অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম।

দ্বারের অপর দিকে দেয়ালে সংলগ্ন পাশাপাশি দু'টি কয়লার উনান, তাহাতে ভাঙা পাথুরে কয়লা স্তূপীকৃত রহিয়াছে ; কিন্তু আগুন নাই। এই অগ্নিহীন চুল্লীর সম্মুখে নতজানু হইয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে—যেন বেদীপ্রান্তে উপাসনারত একটী স্ত্রীমূর্ত্তি। মেয়েটির দেহ সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া আছে, মাথাও বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে ; হাত দুটি লম্বিত দেখিয়া মনে হয় না যে, সে মৃত ! ব্যোমকেশ সন্তর্পণে গিয়া তাহার নাড়ী টিপিল।

তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, নাড়ী নাই। ব্যোমকেশ হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে মেয়েটির চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিল। প্রাণহীন দেহে মৃত্যুকাঠিন্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—মুখ অল্প একটু উঠিল।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী, হাবুলের মত নয়। রং ফর্সা, মুখের গড়ন ধারালো, নীচের ঠোঁট অভিমানিনীর মত স্বভাবতঃই ঈষৎ স্ফুরিত। ষোলো বছর

বয়সের অনুযায়ী দেহ-সৌষ্ঠবও বেশ পূর্ণতা-লাভ করিয়াছে! মাথার দীর্ঘ চুলগুলি বোধ হয় স্নানের পূর্ব্বে বিনুনি খুলিয়া পিঠে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই ভাবেই ছড়ানো আছে। পরিধানে একটি অর্দ্ধ-মলিন গঙ্গা-যমুনা ডুরে; অলঙ্কারের মধ্যে হাতে তিনগাছি করিয়া সোনার চুড়ি, কানে মীনা করা হাল্কা ঝুমকা, গলায় একটি সরু হার।

ব্যোমকেশ নিকট হইতে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর দূর হইতে তাহার বসিবার ভঙ্গী ইত্যাদি সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য কয়েক পা সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া থাকিয়া সে আবার নিকটে ফিরিয়া আসিল; মেয়েটির ডান হাতখানি তুলিয়া করতল পরীক্ষা করিয়া দেখিল। করতলে কয়লার কালি লাগিয়া আছে—সে নিজের হাতে উনানে কয়লা দিয়াছে, সহজেই অনুমান করা যায়। অঙ্গুলীগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অঙ্গুলী দুটি সাবধানে পৃথক করিতেই একটি ক্ষুদ্র জিনিস খসিয়া মাটীতে পড়িল। ব্যোমকেশ সেটি মাটী হইতে তুলিয়া নিজের করতলে রাখিয়া আলোর দিকে পরীক্ষা করিল। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম—একটি দেশলাই-কাঠির অতি ক্ষুদ্র দগ্ধাবশেষ, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া জ্বালিয়া আঙুল পর্য্যন্ত পৌঁছিলে যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু।

গভীর মনঃসংযোগে কাঠিটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ সেটা ফেলিয়া দিল, তারপর মেয়েটির বাঁ হাত তুলিয়া দেখিল। বাঁ হাতটি মুষ্টিবদ্ধ ছিল, মুঠি খুলিতেই একটি দেশলাইয়ের বাক্স দেখা গেল। ব্যোমকেশ বাক্সটি লইয়া খুলিয়া দেখিল, কয়েকটি কাঠি রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'হুঁ। আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলুম। দেশলাই জ্বেলে উনুনে আগুন দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় মৃত্যু হয়েছে।'

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহ ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল ; মেঝের উপর সিক্ত পদচিহ্ন শুকাইয়া অস্পষ্ট দাগ হইয়াছিল, সেগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, মৃত্যুকালে ঘরে আর কেউ ছিল না। পরে এক জন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকেছিলেন, তার পর হাবুল ঢুকেছিল।'

এই সময় বাহিরের শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'বোধ হয় ডাক্তার রুদ্র এলেন। হাবুল, তাঁকে নিয়ে এস।'

হাবুল বাহিরে গেল। আমি এই অবসরে ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝলে?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, 'কিছু না। কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জান্‌ত না যে, মৃত্যু এত নিকট।'

ডাক্তার রুদ্রকে লইয়া হাবুল ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার রুদ্র বয়স্থ লোক ; কলিকাতার একজন নামজাদা চিকিৎসক। কিন্তু অত্যন্ত রূঢ় ও কটুভাষী বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। মেজাজ সর্ব্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত ; এমন কি মুমূর্ষু রোগীর ঘরেও তিনি এমন ব্যবহার করিতেন যে, তিনি না হইয়া অন্য কোনও ডাক্তার হইলে তাঁহার পেশা চলা কঠিন হইয়া পড়িত। একমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি পসার-প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন ; এ ছাড়া তাঁহার মধ্যে অন্য কোনও গুণ আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই।

ডাক্তার রুদ্রের চেহারা হইতেও তাঁহার চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইত। নিকষ কৃষ্ণ গায়ের রং, ঘোড়ার মত লম্বা কদাকার মুখে রক্তবর্ণ দুটা চক্ষুর দৃষ্টি দুর্ব্বিনীত আত্মম্ভরিতায় যেন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। অধরোষ্ঠের গঠনেও ঐ সার্ব্বজনীন অবজ্ঞা ফুটিয়া উঠিতেছে।

তিনি যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন, তখন মনে হইল, মূর্ত্তিমান দম্ভ কোট-প্যাণ্টালুন ও জুতা শুদ্ধ ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল নীরবে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ভগিনীর দেহ দেখাইয়া দিল। ডাক্তার রুদ্র স্বভাব-কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে? মারা গেছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই দেখুন।'

ডাক্তার রুদ্র ব্যোমকেশের দিকে দম্ভ-কষায় নেত্র তুলিয়া বলিলেন, 'আপনি কে?'

'আমি পারিবারিক বন্ধু।'

'ও!'—ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ডাক্তার রুদ্র হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কে—দেবকুমারবাবুর মেয়ে?'

হাবুল ঘাড় নাড়িল।

ডাক্তার রুদ্রের উত্থিত ভ্রূ ললাটে ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ পাইল। তিনি মৃতদেহের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'এরই নাম রেখা?'

হাবুল আবার ঘাড় নাড়িল।

'কি হয়েছিল?'

'কিছু না—হঠাৎ—'

ডাক্তার রুদ্র তখন হাঁটু গাড়িয়া রেখার পাশে বসিলেন; মুহূর্ত্তের জন্য একবার নাড়ীতে হাত দিলেন, একবার চোখের পাতা টানিয়া চক্ষু-তারকা দেখিলেন। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মারা গেছে। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে। Rigor mortis set in করেছে।' কথাগুলি তিনি এমন পরিতৃপ্তের সহিত বলিলেন—যেন অত্যন্ত সুসংবাদ, শুনিবামাত্র শ্রোতারা খুসী হইয়া উঠিবে।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কিসে মৃত্যু হয়েছে, বলতে পারেন কি?'

'সেটা অটপ্সি না ক'রে বলা অসম্ভব। আমি চল্লুম—আমার ভিজিট বত্রিশ টাকা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। আর, পুলিশে খবর দেওয়া দরকার, মৃত্যু সন্দেহজনক।' বলিয়া ডাক্তার রুদ্র প্রস্থান করিলেন।

৩

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিশে খবর পাঠানোই উচিত, নইলে আরও অনেক হাঙ্গামা হ'তে পারে। আমাদের থানার দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।'

এক টুকরা কাগজে তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ব্যোমকেশ চাকরের হাতে দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিল। তার পর বলিল, 'মৃতদেহ এখন নাড়াচাড়া ক'রে কাজ নেই, পুলিশ এসে যা হয় করবে।' দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া কহিল, 'হাবুল, একবার রেখার ঘরটা দেখতে গেলে ভাল হ'ত।'

ভারী গলায় 'আসুন' বলিয়া হাবুল আমাদিগকে উপরে লইয়া চলিল। প্রথম খানিকটা কান্নাকাটি করিবার পর সে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিল; যে যাহা বলিতেছিল, কলের পুতুলের মত তাহাই পালন করিতেছিল।

দ্বিতলে গোটা তিনেক ঘর, তাহার সর্ব্বশেষেরটি রেখার; বাকী দুইটি বোধ করি দেবকুমারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর শয়ন-কক্ষ। রেখার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও পরিপাটীভাবে গোছানো। আসবাব বেশী নাই, যে কয়টি আছে, বেশ পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন। এক ধারে একখানি ছোট খাটের উপর বিছানা ; অপর দিকে জানালার ধারে লিখিবার টেবল। পাশে ক্ষুদ্র সেল্‌ফে দুই সারি বাঙ্গালা বই সাজানো। দেয়ালে ব্রাকেটের উপর একটি আয়না, তাহার পদমূলে চিরুণী, চুলের ফিতা, কাঁটা ইত্যাদি রহিয়াছে। ঘরটির সর্ব্বত্র গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা ও শিক্ষিতা মেয়ের হাতের চিহ্ন যেন আঁকা রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া একবার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, চুলের ফিতা ও কাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিল ; তার পর জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। জানালাটা ঠিক গলির উপরেই ; গলির অপর দিকে একটু পাশে ডাক্তার রুদ্রের প্রকাণ্ড বাড়ী ও ডাক্তারখানা। বাড়ীর খোলা ছাদ জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল ; তার পর ফিরিয়া টেবলের দেরাজ ধরিয়া টানিল।

দেরাজে চাবি ছিল না, টান দিতেই খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ কিছু নাই , দু'একটা খাতা, চিঠি লেখার প্যাড, গন্ধদ্রব্যের শিশি, ছুঁচ-সুতা ইত্যাদি রহিয়াছে। একটা শিশি তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ দেখিল, ভিতরে কয়েকটা সাদা ট্যাবলয়েড রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'অ্যাস্‌পিরিন্‌। রেখা কি অ্যাস্‌পিরিন খেত ?'

হাবুল বলিল, 'হ্যাঁ—মাঝে মাঝে তার মাথা ধরত—'

শিশি রাখিয়া দিয়া আবার ব্যোমকেশ চিন্তিতভাবে ঘরময় পরিভ্রমণ করিল, শেষে বিছানার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিছানায় শয়নের চিহ্ন বিদ্যমান, লেপটা এলোমেলো-ভাবে পায়ের দিকে পড়িয়া আছে, মাথার বালিসে মাথার চাপের দাগ। কিছুক্ষণের জন্য শ্মশান-বৈরাগ্যের মত একটা ভাব মনকে বিষণ্ণ করিয়া দিল—এই ত মানুষের জীবন—যাহার শয়নের দাগ এখনও শয্যা হইতে মিলাইয়া যায় নাই,

সে প্রভাতে উঠিয়াই কোন্ অন্তরের পথে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে মাথার বালিসটা তুলিল; এক খণ্ড ফিকা সবুজ রঙের কাগজ বালিসের তলায় চাপা ছিল, বালিস সরাইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যোমকেশ সচকিতে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, ভাঁজকরা চিঠির কাগজ। সে একবার একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পর চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

আমিও গলা বাড়াইয়া চিঠিখানা পড়িলাম। মেয়েলী ছাঁদের অক্ষরে তাহাতে লেখা ছিল—

'নন্দদা,

আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। তোমার বাবা দশ হাজার টাকা চান, অত টাকা বাবা দিতে পারবেন না।

আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না, এ বোধ হয় তুমি জানো। কিন্তু এ বাড়ীতে থাকাও আর অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাকে একটু বিষ দিতে পার? তোমাদের ডাক্তারখানায় ত অনেক রকম বিষ পাওয়া যায়। দিও. যদি না দাও, অন্য যে-কোনও উপায়ে আমি মরব। তুমি ত জানো, আমার কথার নড়চড় হয় না। ইতি—

তোমার রেখা।'

চিঠিখানা পড়িয়া ব্যোমকেশ নীরবে হাবুলের হাতে দিল। হাবুল পড়িয়া আবার ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রু-উদ্গলিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি জানতুম এই হবে, রেখা আত্মহত্যা করবে—'

'নন্দ কে?'

'নন্তুদা ডাক্তার রুদ্রর ছেলে। রেখার সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। নন্তুদা বড় ভাল, কিন্তু ঐ চামারটা দশ হাজার টাকা চেয়ে বাবাকে রাগিয়ে দিলে—'

ব্যোমকেশ নিজের মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'কিন্তু—; যাক।' তার পর হাবুলের হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া স্নিগ্ধস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। হাবুল রুদ্ধস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশদা, নিজের বলতে আমার ঐ বোনটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মা নেই—বাবাও আমাদের কথা ভাববার সময় পান না—' বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

যা হোক, ব্যোমকেশের স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে কিছুক্ষণ পরে সে অনেকটা শান্ত হইল। তখন ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এখনই পুলিশ আসবে। তার আগে তোমার মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

হাবুলের বিমাতা নিজের ঘরে ছিলেন। হাবুল গিয়া ব্যোমকেশের আবেদন জানাইল, তিনি আড়ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে এক-নজর মাত্র দেখিয়াছিলাম, এখন আরও ভাল করিয়া দেখিলাম।

তাঁহার বয়স বোধ হয় সাতাশ-আটাশ বছর; রোগা লম্বা ধরণের চেহারা, রং বেশ ফর্সা, মুখের গড়নও সুন্দর। কিন্তু তবু তাঁহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলা ত দূরের কথা, চলনসই বলিতেও দ্বিধা হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থায়ী প্রখরতা ভ্রূযুগলের মধ্যে দুইটি ছেদ-রেখা টানিয়া দিয়াছে; পাৎলা সুগঠিত ঠোঁট এমনভাবে ঈষৎ বাঁকা হইয়া আছে, যেন সর্ব্বদাই অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়া শ্লেষ করিতেছে। তাঁহার অসন্তোষ-চিহ্নিত মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, বিবাহের পর হইতে ইনি এক দিনের জন্যও সুখী হন নাই। মানসিক উদারতার অভাবে

সপত্নীসন্তানদের কখনও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, নিজেরও সন্তান হয় নাই ; তাই তাঁহার স্নেহহীন চিত্ত মরুভূমির মত ঊষর ও শুষ্ক রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম--তাঁহার বোধ হয় শুচিবাই আছে। তিনি যেরূপ ভঙ্গীতে দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি নিজেকে ও নিজের ঘরটিকে সর্ব্বপ্রকার অশুদ্ধি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাছে আমরা তাঁহার ঘরে পদার্পণ করিয়া ঘরের নিষ্কলুষ পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিই, তাই তিনি দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আমরা অবশ্য ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম না, বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আজ সকালে রেখার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?'

প্রত্যুত্তরে মহিলাটি একগঙ্গা কথা বলিয়া গেলেন। দেখিলাম, অন্যান্য নারীসুলভ সদ্‌গুণের মধ্যে বাচালতাও বাদ যায় নাই---একবার কথা কহিবার অবকাশ পাইলে আর থামিতে পারে না। ব্যোমকেশের স্বল্পাক্ষর প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার মনের ও সংসারের অধিকাংশ কথাই বলিয়া ফেলিলেন। আজ সকালে ঝি আসে নাই দেখিয়া তিনি রেখাকে রান্না-ঘর নিকাইয়া উনানে আগুন দিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য সপত্নী-সন্তানদের তিনি কখনও আঙুল নাড়িয়াও সংসারের কোনও কাজ করিতে বলেন না—নিজের গতর যতদিন আছে, নিজেই সব করেন। কিন্তু তবু সংসারের ঊনকুটি চৌষট্টি কাজ ত আর একা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তাই তিনি রেখাকে উনান ধরাইতে বলিয়া স্বয়ং নিজের শয়নকক্ষের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান সারিয়া উপরে

চলিয়া আসিয়াছিলেন, রান্নাঘরে কি হইতেছে না হইতেছে, দেখেন নাই। তার পর কাপড় ছাড়িয়া চুল মুছিয়া দশবার ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া নীচে গিয়া দেখেন—ঐ কাণ্ড! সপত্নী-সন্তানদের কোনও কথায় তিনি থাকেন না, অথচ এমনই তাঁহার দুর্দ্দৈব যে, যত ঝঞ্ঝাট তাঁহাকেই পোহাইতে হয়। এখন যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলে হয়ত তাঁহাকেই দূষিবে, বিশেষতঃ কর্ত্তা ফিরিয়া আসিয়া যে কি মহামারী কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। একে ত তিনি কর্ত্তার চক্ষুঃশূল, তিনি মরিলেই কর্ত্তা বাঁচেন।'

বাক্যস্রোত কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সকালে আপনি রেখাকে কি কোনও রূঢ় কথা বলেছিলেন?"

এবার মহিলাটি একবারে ঝাঁকিয়া উঠিলেন, "রূঢ় কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, তেমন ভদ্রলোকের মেয়ে আমি নই। এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি সতীন-পো সতীন-ঝি নিয়ে ঘর করছি, কিন্তু কেউ বলুক দেখি যে, একটা কড়া কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে! তবে আজ সকালে রেখাকে উনুন ধরাতে পাঠালুম, সে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে, 'দেশালাই খুঁজে পাচ্ছি না।'—ব'লে ঘরে ঢুকে ব্রাকেটের উপর থেকে দেশালাই নিলে। আমি তখন মেঝে মুছছিলুম, বললুম, 'বাসি কাপড়ে ঘরে ঢুকলে? এতবড় মেয়ে হয়েছ, এটুকু হুঁস নেই? দেশালাইয়ের দরকার ছিল, দোকান থেকে একটা আনিয়ে নিলেই পারতে।' এইটুকু বলেছি, এ ছাড়া আর একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয় নি। এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে ত ঘাট মানছি।'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'অপরাধের কথা নয়; কিন্তু দেশালাই নিতে রেখা আপনার ঘরে এল কেন? আপনার ঘরেই কি দেশালাই থাকে?'

গৃহিণী বলিলেন, 'হাঁ। রাত্তিরে আমি অন্ধকারে ঘুমতে পারি না, তেলের ল্যাম্প জ্বেলে শুই—তাই ঘরে দেশালাই রাখতে হয়। ঐ ব্র্যাকেটের উপর ল্যাম্প আর দেশালাই থাকে। সবাই জানে, রেখাও জান্‌ত।'

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, খাটের শিয়রের দিকে দেয়ালে একটি ক্ষুদ্র কাঠের ব্র্যাকেট, তাহার উপর ছোট একটি ল্যাম্প রহিয়াছে। ঘরের অন্যান্য অংশও এই সুযোগে দেখিয়া লইলাম। পরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে ঘরের আসবাবপত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। এমন কি, দেয়ালে লম্বিত মা কালীর ছবিখানিও যেন ঘরের শুচিতা-ভঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে জিভ বাহির করিয়া আছেন।

চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে ব্যোমকেশ বলিল, 'ও—তা হ'লে এই সময় রেখাকে আপনি শেষ দেখেন? তার পর আর তাকে জীবিত দেখেন নি?'

'না' বলিয়া গৃহিণী বোধ করি আবার একপ্রস্থ বক্তৃতা সুরু করিতে যাইতেছিল, এমন সময় নীচে হইতে চাকর জানাইল যে, দারোগাবাবু আসিয়াছেন।

আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

দারোগা বীরেনবাবুর সহিত ব্যোমকেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, দু'জনেই দু'জনের কদর বুঝিতেন। বীরেনবাবু মধ্যবয়স্ক লোক, হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা—বিচক্ষণ ও চতুর কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার মধ্যে পুলিশ-সুলভ আত্মম্ভরিতা বা অন্যের কৃতিত্ব লঘু করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। কয়েকটা জটিল ব্যাপারে ব্যোমকেশকে তাঁহার সাহায্য লইতেও দেখিয়াছি। সহরের নিম্নশ্রেণীর গাঁটকাটা ও গুণ্ডাদের চালচলন সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ অভিজ্ঞতা ছিল।

ব্যোমকেশের সহিত মুখোমুখি হইতেই বীরেনবাবু বলিলেন, 'কি খবর, ব্যোমকেশবাবু! গুরুতর কিছু না কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি নিজেই তার বিচার করুন!' বলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

৪

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য রওনা করিয়া দিয়া, দেবকুমারবাবুকে তার পাঠাইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিতে বেলা দুটা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া আমরা যখন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উঠিলাম, তখন শীতের বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বিমনা ও নীরব হইয়া রহিল। আমিও মনের মধ্যে অনুতাপের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। মস্তিষ্কের যে খোরাকের জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা এমন নির্ম্মম ভাবে দেখা দিবে, কে ভাবিয়াছিল? বেচারা হাবুলের কথা বার বার মনে পড়িয়া মনটা ব্যথা-পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ব্যোমকেশ দৃষ্টিহীন চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া নীরব হইয়াই রহিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আত্মহত্যাই তা হ'লে? কি বল?'

ব্যোমকেশ চমকিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ! ও—রেখার কথা বলছ? তোমার কি মনে হয়?'

যদিও মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না, তবু বলিলাম, 'আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? চিঠি থেকে ত ওর অভিপ্রায় বেশ বোঝাই যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে। কি উপায়ে আত্মহত্যা করেছে, তুমি মনে কর?'

'বিষ খেয়ে। সে কথাও ত চিঠিতে—'

'আছে। কিন্তু বিষ পাবার আগেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কি ক'রে হ'তে পারে, আমি ভেবে পাচ্ছি না। চিঠিতে রেখা বিষ চেয়েছিল, কিন্তু চিঠি যখন যথাস্থানে পৌঁছায় নি, লেখিকার বালিসের তলাতেই থেকে গিয়েছিল, তখন বিষ এল কোত্থেকে?''

আমি বলিলাম, 'চিঠিতে আছে, সে বিষ না পেলে অন্য যে কোনও উপায়ে—'

'কিন্তু চিঠি পাঠাবার আগেই সে অন্য উপায় অবলম্বন করবে, এটা তুমি সম্ভব মনে কর?'

আমি নিরুত্তর হইলাম।

কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'তা ছাড়া উনুন জ্বালতে জ্বালতে কেউ আত্মহত্যা করে না। রেখার মৃত্যু এসেছিল অকস্মাৎ—নির্মেঘ আকাশ থেকে বিদ্যুতের মত। এত ক্ষিপ্র এমন অমোঘ এই মৃত্যুবাণ যে, সে একটু নড়বার অবকাশ পায় নি, দেশালাইয়ের কাঠি হাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'কি ক'রে এমন মৃত্যু সম্ভব হ'ল?'

'সেইটেই বুঝতে পারছি না! জানি ত বিষের মধ্যে এক হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড ছাড়া এত ভয়ঙ্কর শক্তি আর কারুর নেই। কিন্তু—ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা চিন্তার মধ্যে নির্ব্বাণ লাভ করিল।

আমি একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, আমি ডাক্তারী সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মৃত্যু সম্ভব নয় কি?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ঐ সম্ভাবনাটাই দেখছি ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। রেখা মাথাধরার জন্যে অ্যাস্‌পিরিন্ খেত, হয়ত ভেতরে ভেতরে হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল—কিন্তু না, কোথায় যেন

বেধে যাচ্ছে, হার্টফেলের সম্ভাবনাটা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারছি না, যদিও যুক্তি-প্রমাণ সব ঐ দিকেই নির্দ্দেশ করছে।' ব্যোমকেশ অপ্রতিভভাবে হাসিল—'বুদ্ধির সঙ্গে মনের আপোষ করতে পারছি না; কেবলই মনে হচ্ছে, মৃত্যুটা সহজ নয়, সাধারণ নয়, কোথায় এর একটা মস্ত গলদ আছে। কিন্তু যাক্, এখন মিথ্যে মাথা গরম ক'রে লাভ নেই। কাল ডাক্তারের রিপোর্ট গেলেই সব বোঝা যাবে।'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া আলো জ্বালিল। এই সময় বহির্দ্বারে আস্তে আস্তে টোকা মারার শব্দ হইল। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যায় নাই, ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'কে? ভেতরে এস!'

একটি অপরিচিত যুবক নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সুশ্রী চেহারা—কিন্তু শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ট্রাজেডির ছায়া পড়িয়াছে। পায়ে রবার সোল জুতা ছিল বলিয়া তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই নাই। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমার নাম মন্মথনাথ রুদ্র—'

ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, 'আপনিই নন্তবাবু? আসুন।'—বলিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া দিল।

চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যুবক থামিয়া থামিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

ব্যোমকেশ টেবলের সম্মুখে বসিয়া বলিল, 'সম্প্রতি আপনার নাম জানবার সুযোগ হয়েছে। আপনি রেখার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে চান?'

যুবকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া গেল, সে বলিল, 'হ্যাঁ। কি ক'রে তার মৃত্যু হ'ল ব্যোমকেশবাবু?'

'তা এখনও জানা যায় নি।'

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু ব্যোমকেশের মুখের উপর রাখিয়া মন্মথ বলিল, 'আপনার কি সন্দেহ সে আত্মহত্যা ক'রেছে?'

'সম্ভব নয়!'

'তবে কি কেউ তাকে —'

'এখনও জোর ক'রে কিছু বলা যায় না।'

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মন্মথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তার পর মুখ তুলিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, 'আপনারা হয়ত শুনেছেন, রেখার সঙ্গে আমার—'

'শুনেছি।'

মন্মথ এতক্ষণ জোর করিয়া সংযম রক্ষা করিতেছিল, এবার ভাঙিয়া পড়িল, অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'ছেলে-বেলা থেকে ভালবাসতুম; যখন রেখার ছ'বছর বয়স, আমি ওদের বাড়ীতে খেলা করতে যেতুম, তখন থেকে। তার পর যখন বিয়ের সম্বন্ধ হ'ল, তখন বাবা এমন এক সত্ত দিলেন যে, বিয়ে ভেঙে গেল। তবু আমি ঠিক করেছিলুম, বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করব। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। বাবা বললেন, বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবেন। তবু আমি—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবার সঙ্গে আপনার কখন ঝগড়া হয়েছিল?'

'কাল দুপুরবেলা। আমি বলেছিলুম, রেখাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। তখন কে জানত যে রেখা—কিন্তু কেন এমন হ'ল ব্যোমকেশবাবু? রেখাকে প্রাণে মেরে কার কি লাভ হ'ল?'

ব্যোমকেশ একটা পেন্সিল লইয়া টেবলের উপর হিজি বিজি কাটিতেছিল, মুখ না তুলিয়া বলিল, 'আপনার বাবার কিছু লাভ হ'তে পারে।'

মন্মথ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, 'বাবা! না না—এ আপনি কি বলছেন? বাবা—'

ত্রাস-বিস্ফারিত-নেত্রে শূন্যের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, মন্মথ আর কোনও কথা না বলিয়া স্খলিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে গাঢ় মনঃসংযোগে টেবলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছে।

৫

পরদিন সকালবেলাটা ডাক্তারের রিপোর্টের প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। কিন্তু রিপোর্ট আসিল না। ব্যোমকেশ ফোন করিয়া থানায় খবর লইল, কিন্তু সেখানে কোনও খবর পাওয়া গেল না।

বৈকালে বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটার সময় দেবকুমারবাবু আসিলেন। আলাপ না থাকিলেও তাঁহার সহিত মুখচেনা ছিল; আমরা খাতির করিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। তিনি হাবুলের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র দিল্লী ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিলেন, আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহার বয়স চল্লিশ কি একচল্লিশ বৎসর; কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও বর্ষীয়ান্ মনে হয়। মোটা-সোটা দেহ, মাথায় টাক, চোখে পুরু কাচের চশমা। তিনি স্বভাবতঃ একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়—অর্থাৎ বাহিরের জগতের চেয়ে অন্তর্লোকেই বেশী বাস করেন। তাঁহার গলাবন্ধ কোট ও গোল চশমা-পরিহিত পেচকের ন্যায় চেহারা কলিকাতার ছাত্রমহলে কাহারও অপরিচিত ছিল না,

প্রতিবেশী বলিয়া আমিও পূর্ব্বে কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিলাম, তাঁহার চেহারা কেমন যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের কোলে গভীর কালীর দাগ, গালের মাংস চুপসিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বের সেই পরিপুষ্ট ভাব আর নাই।

চশমার কাচের ভিতর দিয়া আমার পানে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু?'

আমি ব্যোমকেশকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ও'—বলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা টেবলের উপর রাখিলেন।

ব্যোমকেশ অস্ফুটস্বরে মামুলি দু'একটা সহানুভূতির কথা বলিল; দেবকুমারবাবু বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক পরিভ্রমণ করিল, তার পর তিনি ক্লান্তি-শিথিল স্বরে বলিলেন, 'কাল বেলা দশটায় দিল্লী থেকে বেরিয়ে আজ আড়াইটার সময় এসে পৌঁছেছি। প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ট্রেণে—'

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম; দৈহিক শ্রান্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

দেবকুমার অতঃপর ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'হাবুলের মুখে আপনার কথা শুনেছি—বিপদের সময় সাহায্য করেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সে কি কথা, যদি একটু সাহায্য করতে পেরে থাকি, সে ত প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য।'

'তা বটে; কিন্তু আপনি কাজের লোক—' তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছিল মেয়েটার? কিছু বুঝতে পেরেছেন কি? বাড়ীতে ভাল ক'রে কেউ কিছু বলতে পারলে না।'

ব্যোমকেশ তখন যতখানি দেখিয়াছিল ও বুঝিয়াছিল, দেবকুমার-বাবুকে বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে দেবকুমারবাবু অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে সিগার বাহির করিলেন, সিগার মুখে ধরিয়া তার পর আবার কি মনে করিয়া সেটি টেবলের উপর রাখিয়া দিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, দেখিলাম, ব্যোমকেশের কথা শুনিতে শুনিতে তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, স্নায়বিক উত্তেজনার বশে তাঁহার অস্থির হাত দুটা যে কি করিতেছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই। একবার তিনি চশমা খুলিয়া বড় বড় চোখ দুটা নিষ্পলকভাবে প্রায় দু'মিনিট আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তার পর আবার চশমা পরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশের বিবরণ শেষ হইলে দেবকুমারবাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'হুঁ, ঐ ডাক্তার রুদ্রটা আমার বাড়ীতে ঢুকেছিল! চামার! চণ্ডাল! টাকার জন্য ও পারে না, এমন কাজ নেই। একটা জীবন্ত পিশাচ!' উত্তেজনার বশে তিনি লাঠিটা মুঠি করিয়া ধরিয়া একবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ হঠাৎ ভীষণ হিংস্রভাব ধারণ করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু আবার তাঁহার মুখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমাদের চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, 'আমি যাই। ব্যোমকেশ-বাবু, আর একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিলেন; তার পর ফিরিয়া বলিলেন, 'আমার পয়সা থাকলে এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আপনাকে নিযুক্ত করতুম। কিন্তু আমি গরীব

—আমার পয়সা নেই।' ব্যোমকেশ কি একটা বলিতে চাহিলে তিনি লাঠি নাড়িয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বিনা পারিশ্রমিকে আমি কারুর সাহায্য গ্রহণ করতে পারব না। পুলিশ অনুসন্ধান করছে, তারাই যা পারে করুক। আর, অনুসন্ধান করবার আছেই বা কি? হাজার অনুসন্ধান করলেও আমার মেয়ে ত আর আমি ফিরিয়ে পাব না।' বলিয়া কোনও প্রকার অভিবাদন না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই অদ্ভুত মনুষ্যটি চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল আমরা হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা ভ্রম সংশোধন হ'ল। আমার ধারণা হয়েছিল, দেবকুমার-বাবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন না—সেটা ভুল। অন্ততঃ মেয়েকে তিনি খুব বেশী ভালবাসেন।'

সিগারটা দেবকুমারবাবু ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আশ্চর্য্য অন্যমনস্ক লোক।' বলিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'ডাক্তার রুদ্র'র ওপর ভয়ঙ্কর রাগ দেখলুম।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

সন্ধ্যার পর দারোগা বীরেনবাবু স্বয়ং ডাক্তারের রিপোর্ট লইয়া আসিলেন। বলিলেন, রিপোর্ট বড় disappointing, বারবার পরীক্ষা করিয়াও মৃত্যুর কারণ ধরিতে পারা যায় নাই।

রিপোর্ট পড়িয়া দেখিলাম, ডাক্তার লিখিয়াছেন, দেহের কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই; শরীরের অভ্যন্তরেও কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই। হৃদ্‌যন্ত্র সবল ও স্বাভাবিক, সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য মৃত্যু হয় নাই। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, অকস্মাৎ স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত ঘটিল,

তাহা বলিতে ডাক্তার অক্ষম। এরূপ অদ্ভুত লক্ষণহীন মৃত্যু তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

ব্যোমকেশ কাগজখানা হাতে লইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'এ কেস্ অবশ্য করোনারের কোর্টে যাবে; সেখানে 'অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু' রায় বেরুবে। তার পর আমরা—অর্থাৎ পুলিশ—ইচ্ছে করলে অনুসন্ধান চালাতে পারি, আবার না-ও চালাতে পারি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি বলেন? এই রিপোর্টের পর অনুসন্ধান করলে কোনও ফল হবে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফল হবে কি না বলতে পারি না; কিন্তু অনুসন্ধান চালানো উচিত।'

বীরেনবাবু উৎসুকভাবে বলিলেন, 'কেন বলুন দেখি? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?'

'ঠিক যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সন্দেহ করি, তা নয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে গোলমাল আছে।'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, দেবকুমারবাবুর স্ত্রীকে আপনার কি রকম মনে হ'ল?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, 'দেখুন, আমার মনে হয়, ও-পথে গেলে হবে না। এ মৃত্যুরহস্যের জট ছাড়াতে হ'লে সর্ব্বপ্রথম জানতে হবে—কি উপায়ে মৃত্যু হয়েছিল। এটা যতক্ষণ না জানতে পারছেন, ততক্ষণ একে ওকে সন্দেহ ক'রে কোনও ফল হবে না। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মেয়েটির মৃত্যুর সময় তার সৎমা আর সহোদর ভাই ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাই ব'লে আসল জিনিসটিকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিলে চলবে না।'

'কিন্তু ডাক্তার যে-কথা বলতে পারছে না—'

'ডাক্তার কেবল শব পরীক্ষা করেছেন, আমরা শব ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং ডাক্তার যা পারেন নি আমরাও তা পারব না, এমন কোনও কথা নেই।'

দ্বিধাপূর্ণস্বরে বীরেনবাবু বলিলেন, 'তা বটে—কিন্তু—; যা হোক, আপনি ত দেবকুমারবাবুর পক্ষ থেকে গোড়া থেকেই আছেন, শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয় থাকবেন—দু'জনে পরামর্শ ক'রে চলা যাবে।'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'উহুঁ। এই খানিক আগে দেবকুমারবাবু এসেছিলেন—তিনি আমাকে বরখাস্ত ক'রে গেছেন।'

বিস্মিত বীরেনবাবু বলিলেন, 'সে কি?'

'হ্যাঁ। আমার অবৈতনিক সাহায্য তিনি চান না—আর টাকা দিয়ে আমাকে নিয়োগ করতে তিনি অক্ষম।'

'বটে! কিন্তু অক্ষম কিসে? তিনি ত মোটা মাইনের চাকরী করেন, সাত আটশ' টাকা মাইনে পান শুনেছি।'

'তা হবে।'

বীরেনবাবুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'হুঁ, দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হচ্চে। কিন্তু আপনার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবার কি কারণ থাকতে পারে? তিনি কাউকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন না ত?'

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। দেবকুমারবাবু অপরাধীকে আড়াল করিবার জন্য কৌশলে ব্যোমকেশের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এ কথা শুনিতে যেমন অদ্ভুত, তেমনিই হাস্যকর।

বীরেনবাবু ঈষৎ তীক্ষ্নস্বরে বলিলেন, 'হাসছেন যে?'

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, 'আপনি দেবকুমারবাবুকে দেখেছেন?'

'না।'

'তাঁকে দেখলেই বুঝবেন, কেন হাসছি।'

অতঃপর বীরেনবাবু উঠিলেন। বিদায়কালে ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'আমি এ ব্যাপারের তল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক'রে দেখব, যদি কিনারা করতে পারি।—আপনি কিন্তু ছাড়া পাবেন না। দেবকুমারবাবু আপনাকে বরখাস্ত করেছেন বটে, কিন্তু দরকার হ'লে আমি আপনার কাছে আসব মনে রাখবেন।'

ব্যোমকেশ খুসী হইয়া বলিল, 'সে ত খুব ভাল কথা। আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। হাবুলের সম্পর্কে এ ব্যাপারে আমার একটা ব্যক্তিগত আকর্ষণও রয়েছে।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আচ্ছা, উপস্থিত কোন্ পথে চললে ভাল হয়, কিছু ইঙ্গিত দিতে পারেন কি? যা হোক একটা সূত্র ধ'রে কাজ আরম্ভ করতে হবে ত।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'ডাক্তার রুদ্র'র দিক থেকে কাজ আরম্ভ করুন; এ গোলক-ধাঁধার সত্যিকার পথ হয় ত ঐ দিকেই আছে।'

বীরেনবাবু চকিতভাবে চাহিলেন। 'ও—আচ্ছা—'

তিনি নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

৬

ইহার পর পাঁচ ছয় দিন একটানা ঘটনাহীনভাবে কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ আবার যেন ঝিমাইয়া পড়িল। সকালে কাগজ পড়া এবং বৈকালে টেবলের উপর পা তুলিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু শূন্যে মেলিয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কাজ রহিল না।

বীরেনবাবুও এ কয় দিনের মধ্যে দেখা দিলেন না ; তাই তাঁহার তদন্ত কতদূর অগ্রসর হইল, জানিতে পারিলাম না। আগন্তুকের মধ্যে কেবল হাবুল একবার করিয়া আসিত। সে আসিলে ব্যোমকেশ নিজের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নানাবিধ আলোচনায় তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু হাবুলের মনে যেন একটা বিমর্ষ অবসন্নতা স্থায়িভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে নৈরাশ্যপূর্ণ দীপ্তিহীন চোখে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত, তার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

বাড়ীতে কি হইতেছে না হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেও সে ভালরূপ জবাব দিতে পারিত না। বিমাতার রসনা নরম না হইয়া আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথার ভঙ্গীতে ইহার আভাস পাইতাম। শেষদিন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাবা আজ রাত্রে পাটনা যাচ্ছেন ; সেখানে য়ুনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে হবে!' বুঝিলাম, লোকের উপর অহর্নিশি কথার কচকচি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পলায়ন করিতেছেন। এই নির্লিপ্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকের পারিবারিক অশান্তির কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল।

সে দিন হাবুল প্রস্থান করিবার পর বীরেনবাবু আসিলেন। তাঁহার

মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। যাহোক ব্যোমকেশ তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইল।

আমাদের বৈকালিক চায়ের সময় হইয়াছিল, অচিরাৎ চা আসিয়া পৌঁছিল। তখন ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তার পর—খবর কিছু আছে?'

পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিমর্ষভাবে বীরেনবাবু বলিলেন, 'কোনও দিকেই কিছু সুবিধা হচ্ছে না। যেদিকে হাত বাড়াচ্ছি কিছু ধরতে ছুঁতে পারছি না; প্রমাণ পাওয়া ত দূরের কথা, একটা সন্দেহের ইসারা পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এর ভেতর একটা গভীর রহস্য লুকোনো রয়েছে; যতই প্রতিপদে ব্যর্থ হচ্ছি, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানতে পেরেছেন?'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি অবশ্য রিপোর্টের বাইরে যেতে রাজি নন, তবু মনে হ'ল, তাঁর একটা থিয়োরি আছে। তিনি মনে করেন, কোনও অজ্ঞাত বিষের বাষ্প নাকে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি খুব অস্পষ্ট আবছায়াভাবে কথাটা বললেন বটে, তবু মনে হ'ল, তাঁর ঐ বিশ্বাস।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'উনুন ধরাবার সময় মৃত্যু হয়েছিল, এ কথা ডাক্তারকে বলেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর এ দিকে? ডাক্তার রুদ্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। যতদূর জানতে পারলুম, লোকটা নির্জ্জলা পাষণ্ড আর অর্থ-

পিশাচ। কয়েক জন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর উপর নিজের আবিষ্কৃত ইন্‌জেকশান পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের সাবাড় করেছে, এ গুজবও শুনেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ব্যাপারে তাকে খুনের আসামী করা যায় না। দেবকুমারবাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল, এ খবরও ঠিক। লোকটা দশ হাজার টাকা বরপণ দাবী করেছিল। দেবকুমারবাবুর অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, কাজেই তাঁকে সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হ'ল। ডাক্তার রুদ্র'র ছেলেটা কিন্তু ভদ্রলোক, বাপের সঙ্গে এই নিয়ে তার ভীষণ ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এ বাড়ীতে এই কাণ্ড--মেয়েটি হঠাৎ মারা গেল। তার পর ছোকরাটি শুনলুম বাড়ী ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে; তার বিশ্বাস, তার বাপই প্রকারান্তরে মেয়েটির মৃত্যুর কারণ।'

মন্মথ যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ নূতন বটে, কিন্তু আর সব কথাই আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। তাই পুরাতন কথা শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। বীরেনবাবু থামিলে সে প্রশ্ন করিল, 'দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন বলেছিলেন, করেছিলেন না কি?'

'করেছিলুম। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ধারকর্জ্জ নেই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করা তাঁর অসাধ্য। লোকটি বোধ হয় একটু বেহিসাবী, সাংসারিক বুদ্ধি কম। কলেজ থেকে বর্ত্তমানে তিনি আটশ' টাকা মাইনে পান, কিন্তু শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, এই আটশ' টাকার অধিকাংশই যায় তাঁর বীমা কোম্পানীর পেটে। পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করিয়েছেন, তাও এত বেশী বয়সে যে প্রিমিয়াম দিয়ে হাতে বড় কিছু থাকে না।'

ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে বলিল, 'পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স। নিজের নামে করেছেন?'

'শুধু নিজের নামে নয়—জয়েণ্ট পলিসি, নিজের আর স্ত্রীর নামে। মাত্র এক বছর হ'ল পলিসি নিয়েছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তিনি মারা গেলে পাছে বিধবাকে পথে দাঁড়াতে হয়, এই জন্যেই বোধ হয় দু'জনে একসঙ্গে বীমা করিয়েছেন। এ টাকায় উত্তরাধিকারীদের দাবী থাকবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আর কিছু?'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আর কি? দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুলের পিছনেও লোক লাগিয়েছিলুম—যদি কিছু জান্‌তে পারা যায়। সে ছোকরা কেমন যেন পাগলাটে ধরণের, কলেজে বড় একটা যায় না, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কখনও পার্কে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। আপনার কাছেও রোজ একবার ক'রে আসে, জান্‌তে পেরেছি।'

এই সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশের সে শৈথিল্য আর নাই, সে যেন অন্তরে-বাহিরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন পরে তাহার চোখে সেই চাপা উত্তেজনার প্রখর দৃষ্টি দেখিতে পাইলাম। কিছু না বুঝিয়াও আমার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ কিন্তু বাহিরে কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করিল না, পূর্ব্ববৎ বিরসস্বরে বলিল, 'হাবুলকে বাদ দিতে পারেন। উঠছেন না কি? থানাতেই থাকবেন ত? আচ্ছা যদি দরকার হয়, ফোনে খবর নেব।'

বীরেনবাবু একটু অবাক্ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ পিছনে হাত দিয়া ঘরময় পায়চারি করিল; দেখিলাম, তাহার চোখে সেই পুরাতন আলো জ্বলিতেছে। বীরেনবাবুকে সে হঠাৎ এমন ভাবে বিদায় দিল কেন, জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি এমন সময় সে চেয়ারের পিঠ হইতে শালখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, 'চল

একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। বন্ধ ঘরে ব'সে ব'সে মাথাটা গরম বোধ হচ্ছে।'

দু'জনে বাহির হইলাম। অকারণে বাড়ীর বাহির হইতে ব্যোমকেশের একটা মজ্জাগত বিমুখতা ছিল ; কাজ না থাকিলে সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমিও তাহার সঙ্গদোষে কুণো হইয়া পড়িয়াছিলাম, একাকী কোথাও যাইবার অভ্যাসও ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাই আজ তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ফাঁকা যায়গার বিশুদ্ধ বাতাস কামনা করিতেছে দেখিয়া খুসী হইয়া উঠিলাম।

পথে চলিতে চলিতে কিন্তু খুসীর ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। জন-সঙ্কুল পথে ব্যোমকেশ এমনই বাহ্জ্ঞানহীন উদ্ভ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল যে, ভয় হইল এখনই হয় ত একটা কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। আমি তাহাকে সামলাইয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অপ্রশমিত বেগে ইহাকে উহাকে ধাক্কা দিয়া, একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পা মাড়াইয়া দিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পুস্তকহস্তা এক তরুণীকে ঠেলা দিয়া দৃক্‌পাত না করিয়া জগন্নাথের অপ্রতিহত রথের মত অগ্রসর হইয়া চলিল। বাস্তবিক, এতটা আত্মবিস্মৃত তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাহার মন যে অকস্মাৎ শিকারের সন্ধান পাইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হারাইয়া ছুটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেছিলাম বটে, কিন্তু তাহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন পথচারী তাহা বুঝিবে কেন ?

ভর্ৎসনা-ভ্রূকুটির স্রোত পিছনে ফেলিয়া কোনক্রমে কলেজ স্কোয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। হাস্য-আলাপরত ছাত্রদের আবর্ত্তমান জনতায় স্থানটি ঘূর্ণিচক্রের মত পাক খাইতেছে। আমি আর দ্বিধা না করিয়া ব্যোমকেশের হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। এখানে আর যাহাই হউক্, বৃদ্ধ এবং তরুণীকে বিমর্দ্দিত করিবার সম্ভাবনা নাই

সুতরাং অশিষ্টতা যদি কিছু ঘটিয়া যায়, ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া যাইবে। আমাদের দেশের ছাত্ররা স্বভাবত কলহপ্রিয় নয়।

পুকুরকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি জনপ্রবাহ বিপরীত মুখে ঘুরিতেছে; আমরা একটি প্রবাহে মিশিয়া গেলাম, সংঘাতের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া গেল। ব্যোমকেশ তখনও স্থানকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, তাহার ললাট একাগ্রচিন্তার সঙ্কোচনে ভ্রূকুটিবন্ধুর; কাঁধের শাল মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, বীরেনবাবুর কথার মধ্যে এমন কি ছিল, যাহা ব্যোমকেশের নিষ্ক্রিয় মনকে অকস্মাৎ পাঞ্জাব মেলের এঞ্জিনের মত সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে? তবে কি রেখার মৃত্যু-সমস্যার সমাধান আসন্ন?

সমাধান যে কত আসন্ন, তখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আধ ঘণ্টা এই ভাবে পরিভ্রমণ করিবার পর ব্যোমকেশের বাহ্য-চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; সে সহজ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইল। বলিল, 'আজ দেবকুমারবাবু পাটনা যাবেন—না?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

'তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না—' ব্যোমকেশ সম্মুখদিকে তাকাইয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিলাম, এক কোণে একখানি বেঞ্চি ঘিরিয়া অনেক ছেলে জড় হইয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছে। ভিড়ের বাহিরে যাহারা ছিল, তাহারা গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল, অসাধারণ কিছু ঘটিয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

ছেলেটি বলিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয়, কেউ হঠাৎ বেঞ্চে ব'সে ব'সে মারা গেছে।'

ব্যোমকেশ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, আমিও তাহার পশ্চাতে রহিলাম। বেঞ্চির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি ছোকরা ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে—যেন বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, পা সম্মুখদিকে প্রসারিত। অধরোষ্ঠ হইতে একটি সিগারেট ঝুলিতেছে—সিগারেটে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতের মধ্যে একটি দেশালাইয়ের বাক্স।

একটি মেডিক্যাল ছাত্র নাড়ী ধরিয়া দেখিতেছিল, বলিল, 'নাড়ী নেই—মারা গেছে।'

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ভিড়ের মধ্যে ভাল দেখা যাইতেছিল না। ব্যোমকেশ চিবুক ধরিয়া মৃতের আনমিত মুখ তুলিয়াই যেন বিদ্যুদাহতের মত ছাড়িয়া দিল।

আমারও বুকে হাতুড়ির মত একটা প্রবল আঘাত লাগিল ; দেখিলাম —আমাদের হাবুল।

৭

পুলিশ আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। আমরা দেবকুমারবাবুর ঠিকানা পুলিশকে জানাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

তখন রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিতে ফিরিতে ব্যোমকেশ কয়েকবার যেন ভয়ার্ত্ত শ্বাস-সংহত স্বরে বলিল, 'উঃ! নিয়তির কি নির্ম্মম প্রতিশোধ! কি নিদারুণ পরিহাস!'

আমার মাথার ভিতর বুদ্ধিবৃত্তি যেন স্তম্ভিত নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল ;

তবু, অসীম অনুশোচনার সঙ্গে কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল— পরলোক যদি থাকে, তবে যাহার মৃত্যুতে হাবুল এত কাতর হইয়াছিল সেই পরম স্নেহাস্পদ ভগিনীর সহিত তাহার এতক্ষণে মিলন হইয়াছে।

বাসায় পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ নিজের লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। শুনিতে পাইলাম, সে টেলিফোনে কথা বলিতেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্লান্তস্বরে পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিতে বলিল, তার পর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যে ট্রাজেডির শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, তাহার সম্বন্ধে বৃথা প্রশ্ন করিয়া আমি আর তাহাকে বিরক্ত করিলাম না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বীরেনবাবু আসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওয়ারেণ্ট এনেছেন ?'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িলেন।

তখন আবার আমরা বাহির হইলাম।

দেবকুমারবাবুর বাসায় আসিতে তিন চার মিনিট লাগিল। দেখিলাম, বাড়ী নিস্তব্ধ, উপরের ঘরগুলির জানালায় আলো নাই, কেবল নীচে বসিবার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে।

বীরেনবাবু কড়া নাড়িলেন, কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল না। তখন তিনি দ্বার ঠেলিলেন, ভেজানো দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাহিরের ক্ষুদ্র ঘরটিতে তক্তপোষ পাতা, তাহার উপর দেবকুমারবাবু নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর

তাঁহার মুখে একটা তিক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'সকলি গরল ভেল—'

বীরেনবাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।'

দেবকুমারবাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি দারগাবাবুর পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আপনারা এসেছেন—ভালই হ'ল। আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলুম—' দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'হাতকড়া লাগান্।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'তার দরকার নেই। কোন্ অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল শুনুন—' বলিয়া অভিযোগ পড়িয়া শুনাইবার উপক্রম করিলেন।

দেবকুমারবাবু কিন্তু ইতিমধ্যে আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন; পকেটে হাত দিয়া তিনি যেন কি খুঁজিতে খুঁজিতে নিজমনে বলিলেন, 'নিয়তি! নইলে হাবুলও ঐ বাক্স থেকেই দেশলায়ের কাঠি বার করতে গেল কেন? কি ভেবেছিলুম, কি হ'ল!' ভেবেছিলুম, রেখার ভাল বিয়ে দেব, নিজের একটা বড় ল্যাবরেটারী করব, হাবুলকে বিলেত পাঠাব—' পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তিনি মুখে ধরিলেন।

ব্যোমকেশ নিজের দেশলাই জ্বালিয়া তাঁহার সিগারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। তার পর বলিল, 'দেবকুমারবাবু, আপনার দেশালাইটা আমাদের দিতে হবে।'

দেবকুমারবাবুর চোখে আবার সচেতন দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু? আপনিও এসেছেন? ভয় নেই—আমি আত্মহত্যা করব না। ছেলেকে মেরেছি—মেয়েকে মেরেছি, আমি খুনী আসামীর মত ফাঁসীকাঠে ঝুলতে চাই—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেশলাইয়ের বাক্সটা তবে দিন।'

পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া দেবকুমারের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, 'নিন্, কিন্তু সাবধান, বড় ভয়ানক জিনিষ। প্রত্যেকটি কাঠি এক-একটি মৃত্যুবাণ। একবার জ্বাললে আর রক্ষে নেই—' ব্যোমকেশ দেশলাইয়ের বাক্সটা বীরেনবাবুর হাতে দিল, তিনি সন্তর্পণে সেটা পকেটে রাখিলেন। দেবকুমারবাবু বলিয়া চলিলেন, 'কি অদ্ভুত আবিষ্কারই করেছিলুম; পলকের মধ্যে মৃত্যু হবে, কিন্তু কোথাও এতটুকু চিহ্ন থাকবে না। আধুনিক যুদ্ধ-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যেত! বিষ নয়—এ মহামারী। কিন্তু সকলি গরল ভেল—' তিনি বুকভাঙা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীরেনবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, এবার যাবার সময় হয়েছে।'

'চলুন'—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ একটু কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার স্ত্রী কি বাড়ীতেই আছেন?'

'স্ত্রী!'—দেবকুমারবাবুর চোখ পাগলের চোখের মত ঘোলা হইয়া গেল, তিনি হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'স্ত্রী! আমার ফাঁসির পর ইন্সিওরেন্সের সব টাকা সে-ই পাবে! প্রকৃতির পরিহাস নয়? চলুন।'

একটা ট্যাক্সি ডাকা হইল। ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া দেবকুমার-বাবুকে তাহাতে তুলিয়া দিল; বীরেনবাবু তাঁহার পাশে বসিলেন। দুই জন কনেষ্টবল ইতিমধ্যে কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারাও ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল।

দেবকুমারবাবু গাড়ীর ভিতর হইতে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু

আপনি আমার রেখার মৃত্যুর কিনারা কর্‌তে চেয়েছিলেন—আপনাকে ধন্যবাদ—'

আমরা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

* * * *

দিন দুই ব্যোমকেশ এ বিষয়ে কোনও কথা কহিল না। তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

তৃতীয় দিন বৈকালে সে নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল; এলোমেলো ভাবে কতকটা যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল—

'ইংরেজীতে একটা কথা আছে—vengence coming home to roost, দেবকুমারবাবুর হয়েছিল তাই! নিজের স্ত্রীকে তিনি মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এমনই অদৃষ্টের খেলা, দু'বার তিনি তাঁর অমোঘ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন, দু'বারই সে অগ্নিবাণ লাগল গিয়ে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যার বুকে।

'দেবকুমার অপ্রত্যাশিত ভাবে এক আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে সে আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এ এমনই আবিষ্কার যে, তার পেটেণ্ট নেওয়া চলে না; কারণ, সাধারণ ব্যবসায়-জগতে এর ব্যবহার নেই। কিন্তু ঘুণাক্ষরে এর ফরমুলা জানতে পারলে জাপান জার্ম্মানী ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধোন্মত্ত রাজ্যলোলুপ জাতি নিজেদের কারখানায় এই প্রাণঘাতী বিষ তৈরী করতে আরম্ভ ক'রে দেবে। আবিষ্কর্ত্তা কিছুই করতে পারবেন না, এতবড় আবিষ্কার থেকে তাঁর এক কপর্দ্দক লাভ হবে না।

'সুতরাং আবিষ্কারের কথা দেবকুমারবাবু চেপে গেলেন। প্রথমে টাকা চাই, কারণ, এ বিষ কি ক'রে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আরও অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করা দরকার। কিন্তু টাকা

কোথায় ? এত বড় এক্সপেরিমেণ্ট গোপনে চালাতে গেলে নিজের ল্যাবরেটারী চাই—তাতে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে ?

'এ দিকে বাড়ীতে দেবকুমারবাবুর স্ত্রী তাঁর জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুলেছিলেন। মানসিক পরিশ্রম যারা করে, তারা চায় সাংসারিক ব্যাপারে শান্তি, অথচ তাঁর জীবনে ঐ জিনিসটির একান্ত অভাব হয়ে উঠেছিল। এক শুচিবায়ুগ্রস্ত মুখরা স্নেহহীনা স্ত্রীর নিত্য সাহচর্য্য তাঁকে পাগলের মত ক'রে তুলেছিল। এটা অনুমানে বুঝতে পারি ; দেবকুমার-বাবু স্বভাবত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন, শান্তিতে নিজের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারলে তিনি আর কিছু চান না। তাঁর মনটি যে খুব স্নেহপ্রবণ, তাঁর ছেলেমেয়ের প্রতি ভালবাসা দেখেই আন্দাজ করা যায়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও চেষ্টা করলে এই স্নেহের অংশ পেতে পারতেন ; কিন্তু স্বভাবদোষে তিনি তা পেলেন না ; বরঞ্চ দেবকুমারবাবু তাঁকে বিষবৎ ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন।

নিজের স্ত্রীকে হত্যা করবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক নয় ; যখন এ প্রবৃত্তি তার হয়, তখন বুঝতে হবে—সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দেবকুমারবাবুরও সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তারপর তিনি যখন এই ভয়ঙ্কর বিষ আবিষ্কার করলেন, তখন বোধ হয়, প্রথমেই তাঁর মনে হ'ল স্ত্রীর কথা। তিনি মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন।

'তারপর তাঁর সব সংশয়ের সমাধান ক'রে বীমা কোম্পানীর যুগ্মজীবন পলিসির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল—স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে জীবন বীমা করতে পারে, এক জন মরলে অন্য জন টাকা পাবে। এমন সুযোগ তিনি আর কোথায় পাবেন ? যদি এই ভাবে জীবন বীমা ক'রে তাঁর আবিষ্কৃত বিষ দিয়ে স্ত্রীকে মারতে পারেন—এক ঢিলে দুই পাখী মরবে ; তিনি তাঁর

বাঞ্ছিত টাকা পাবেন, স্ত্রীও মরবে এমন ভাবে যে, কেউ বুঝতে পারবে না, কি ক'রে মৃত্যু হ'ল।

'দেবকুমারবাবু একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন বীমা করালেন, তারপর অসীম ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না, বীমা কোম্পানীর সন্দেহ হ'তে পারে। এই ভাবে এক বছর কেটে গেল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, এই বড় দিনের ছুটীতে তাঁর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবেন।

'তাঁর আবিষ্কৃত বিষের প্রকৃতি অনেকটা বিস্ফোরক বারুদের মত; এম্‌নিতে সে অতি নিরীহ, কিন্তু একবার আগুনের সংস্পর্শে এলে তার ভয়ঙ্কর শক্তি বাষ্পরূপ ধ'রে বেরিয়ে আসে। সে-বাষ্প কারুর নাকে কণামাত্র গেলেও আর রক্ষে নেই, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।

দেবকুমারবাবু তাঁর স্ত্রীর উপর এই বিষপ্রয়োগ করবার এক চমৎকার উপায় বার করলেন। বৈজ্ঞানিক মাথা ছাড়া এমন বুদ্ধি বেরোয় না। তিনি কতকগুলি দেশালাইয়ের কাঠির বারুদের সঙ্গে এই বিষ মাখিয়ে দিলেন। কি উপায়ে মাখালেন, বলতে পারি না, কিন্তু ফল দাঁড়ালো— যিনি সেই কাঠি জ্বালবেন, তাঁকেই মরতে হবে। এই ভাবে বিষাক্ত দেশালাইয়ের কাঠি তৈরী ক'রে তিনি দিল্লীতে বিজ্ঞানসভার অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। ক্রমে দিল্লীতে যাবার সময় উপস্থিত হ'ল; তখন তিনি সময় বুঝে তাঁর স্ত্রীর দেশালাইয়ের বাক্সতে একটি কাঠি রেখে দিয়ে দিল্লীতে যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর স্ত্রী রোজ রাত্রিতে শোবার আগে ঐ দেশালাই দিয়ে ল্যাম্প জ্বালেন—এ দেশালাইয়ের বাক্স অন্যত্র ব্যবহার হয় না। আজ হোক, কাল হোক, গৃহিণী সেই কাঠিটি জ্বালবেন। দেবকুমারবাবু থাকবেন তখন ন'শ মাইল দূরে—এ যে তাঁর কাজ, এ কথা কেউ মনেও আনতে পারবে না।

'সবই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। স্ত্রীর বদলে রেখা উনুন ধরাতে গিয়ে সেই কাঠিটি জ্বাললে।

'দিল্লী থেকে দেবকুমারবাবু ফিরে এলেন। এই বিপর্য্যয়ে তাঁর মন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও বিষিয়ে উঠল। তাঁর জিদ্ চ'ড়ে গেল, মেয়ে যখন গিয়েছে, তখন ওকেও তিনি শেষ ক'রে ছাড়বেন। কয়েক দিন কেটে গেল, তারপর আবার তিনি স্ত্রীর দেশালাইয়ের বাক্সে একটি কাঠি রেখে পাটনা যাবার জন্য তৈরী হলেন।

'কিন্তু এবার আর তাঁকে যেতে হ'ল না। হাবুল সিগারেট খেত; বোধহয়, তার দেশালাইয়ের বাক্সটা খালি হ'য়ে গিয়েছিল, তাই সে সৎমার ঘরের দেশালাইয়ের বাক্স থেকে কয়েকটি কাঠি নিজের বাক্সে পূরে নিয়ে বেড়াতে চ'লে গেল। তারপর—

'কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ! কালকূট যে দেবকুমারবাবু বিজ্ঞানসাগর মন্থন ক'রে তুলেছিলেন, তাঁর জীবনে—সকলি গরল ভেল।'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

কিয়ৎকাল পরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, দেবকুমারবাবু যে অপরাধী, এটা তুমি প্রথম বুঝলে কখন্?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে মুহূর্ত্তে শুনলুম যে, দেবকুমারবাবু পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন বীমা করিয়েছেন, সেই মুহূর্ত্তে। তার আগে রেখাকে হত্যা করবার একটা সন্তোষজনক উদ্দেশ্যই পাওয়া যাচ্ছিল না। কে তাকে মেরে লাভবান্ হ'ল, কার স্বার্থে সে ব্যাঘাত দিচ্ছিল—এ কথাটার ভাল রকম জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। রেখা যে হত্যাকারীর লক্ষ্য নয়, তা ত আমরা জানতুম না।

'কিন্তু আর এক দিক্ থেকে একটি ছোট্ট সূত্র হাতে এসেছিল। রেখার দেহ-পরীক্ষায় যখন বিষ পাওয়া গেল না, তখন কেবল একটা

সম্ভাবনাই গ্রহণযোগ্য রইল—অর্থাৎ যে-বিষে তার মৃত্যু হয়েছে, সে-বিষ বৈজ্ঞানিকদের অপরিচিত। মানে, নূতন আবিষ্কার। মনে আছে—দিল্লীতে দেবকুমারবাবুর বক্তৃতা ? আমরা তখন সেটা অক্ষমের বাহ্বাস্ফোট ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কে জান্‌ত, তিনি সত্যিই এক অদ্ভুত আবিষ্কার ক'রে ব'সে আছেন ; আর, তারই চাপা ইঙ্গিত তাঁর বক্তৃতায় ফুটে বেরুচ্ছে !

'সে যা হোক, কথা দাঁড়ালো—এই নূতন আবিষ্কার কোথা থেকে এল ? দু'জন বৈজ্ঞানিক হাতের কাছে রয়েছে—এক ডাক্তার রুদ্র, দ্বিতীয় দেবকুমারবাবু। এঁদের দু'জনের মধ্যে এক জন এই অজ্ঞাত বিষের আবিষ্কর্ত্তা। কিন্তু ডাক্তার রুদ্র'র উপর সন্দেহটা বেশী হয়, কারণ তিনি ডাক্তার, বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁরই বেশী। তা ছাড়া দেবকুমারবাবু বিষের আবিষ্কর্ত্তা হ'লে তিনি কি নিজের মেয়ের উপর সে বিষ প্রয়োগ করবেন ?

'কাজেই সব সন্দেহ পড়ল গিয়ে ডাক্তার রুদ্র'র উপর। কিন্তু তবু আমার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। ডাক্তার রুদ্র লোকটা অতি পাজি, কিন্তু তাই ব'লে সে এত সামান্য কারণে একটি মেয়েকে খুন করবে ? আর, যদিই বা সে তা করতে চায়, রেখার নাগাল পাবে কি ক'রে ? কোন্ উপায়ে আর একজনের বাড়ীতে বিষ পাঠাবে ? রেখার সঙ্গে মন্মথর ছাদের উপর থেকে দেখাদেখি চিঠি-ফেলাফেলি চল্‌ত ; কিন্তু রুদ্র'র সঙ্গে ত সে রকম কিছু ছিল না।

'কোনও বিষাক্ত বাষ্পই যে মৃত্যুর কারণ, এ চিন্তাটা গোড়া থেকে আমার মাথায় ধোঁয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে ক'রে দেখ, রেখার এক হাতে পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি, আর এক হাতে বাক্স ছিল; অর্থাৎ দেশালাই জ্বালার পরই মৃত্যু হয়েছে। সংযোগটা সম্পূর্ণ আকস্মিক

হ'তে পারে, আবার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধও থাকতে পারে। দেবকুমারবাবু কিন্তু বড় চালাকী করেছিলেন, বাক্সে একটি বৈ বিষাক্ত কাঠি দেন নি— যাতে বাক্সের অন্যান্য কাঠি পরীক্ষা ক'রে কোনও হদিস পাওয়া না যায়। আমি সে বাক্সটা এনেছিলুম, পরীক্ষাও করেছিলুম, কিন্তু কিছু পাই নি। হাবুলের বেলাতেও বাক্সে একটি বিষাক্ত কাঠিই ছিল, কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈব যে, সেইটেই হাবুল পকেটে ক'রে নিয়ে এল—আর প্রথমেই জ্বাললে।

'অজিত, তুমি ত লেখক, দেবকুমারবাবুর এই ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রূপক দেখতে পাচ্ছ না? মানুষ যে দিন প্রথম অন্যকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সে দিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্ম্মাণ করেছিল; আর আজ সারা পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই যে হিংসার কুটিল বিষ তৈরী হচ্ছে, এও মানুষ জাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস ক'রে ফেলবে—ব্রহ্মার ধ্যান-উদ্ভূত দৈত্যের মত সে স্রষ্টাকেও রেয়াৎ করবে না। মনে হয় না কি?'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশকে ভাল দেখা যাইতেছিল না। আমার মনে হইল, তাহার শেষ কথাগুলা কেবল জল্পনা নয়— ভবিষ্যদ্‌বাণী।

উপসংহার

১

হাইকোর্টে দেবকুমারবাবুর মামলা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

মাঘমাসের মাঝামাঝি। শীতের প্রকোপ অল্পে অল্পে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া অদূর বসন্তের বার্ত্তা জানাইয়া দিলেও, সকাল বেলায় সোনালী রৌদ্রটুকু এখনও বেশ মিঠা লাগে।

সেদিন সকালে আমি একাকী জানালার ধারে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতে করিতে সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে ছিলাম। ব্যোমকেশ প্রাতরাশ শেষ করিয়াই কি একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল ; বলিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে দশটা বাজিবে।

খবরের কাগজে দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমার শেষ কিস্তি বিবরণ বাহির হইয়াছিল। কাগজে বিবরণ পড়িবার আমার কোনও দরকার ছিল না ; কারণ আমি ও ব্যোমকেশ মোকদ্দমার সময় বরাবরই এজলাসে হাজির ছিলাম। তাই অলসভাবে কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ভাবিতেছিলাম—দেবকুমারবাবুর অসম্ভব জিদের কথা। তিনি একটু নরম হইলে হয়ত এতবড় খুনের মোকদ্দমা চাপা পড়িয়া যাইত ; কারণ উচ্চ রাজনীতি পিনাল কোডের শাসন মানিয়া চলে না। কিন্তু সেই যে তিনি জিদ্ ধরিয়া বসিলেন আবিষ্কারের ফরমূলা কাহাকেও বলিবেন না—সে-জিদ্ হইতে কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। দেশলাই কাঠি বিশ্লেষ করিয়াও বিষের মূল উপাদান ধরা গেল না। অগত্যা আইনের নাটিকা

যথারীতি অভিনীত হইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িয়া গেল।

চিন্তা ও কাগজ পড়ার মধ্যে মনটা আনাগোনা করিতেছিল, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। উঠিয়া গিয়া ফোন্ ধরিলাম। বীরেনবাবু দারোগা থানা হইতে ফোন্ করিতেছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজিত ব্যগ্রতার আভাস পাইলাম।

'ব্যোমকেশবাবু আছেন ?'

'তিনি বেরিয়েছেন। কোনও জরুরী দরকার কি ?'

'হাঁ—তিনি কখন ফিরবেন ?'

'দশটার সময়।'

'আচ্ছা, আমিও দশটার সময় গিয়ে পৌঁছুব। একটা খারাপ খবর আছে।'

খবরটা কি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বীরেনবাবু ফোন্ কাটিয়া দিলেন। ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। ঘড়িতে দেখিলাম বেলা ন'টা। মন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, তবু সংবাদপত্রটা তুলিয়া লইয়া যথাসম্ভব ধীরভাবে দশটা বাজার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না, সাড়ে ন'টার পরই ব্যোমকেশ ফিরিল।

বীরেনবাবু ফোন্ করিয়াছেন শুনিয়া সচকিতভাবে বলিল, 'তাই নাকি! আবার কি হ'ল ?'

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন পুঁটিরামকে ডাকিয়া চায়ের জল চড়াইতে বলিল ; কারণ, বীরেনবাবুকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে চায়ের আয়োজন চাই ; চা সম্বন্ধে তাঁহার এমন একটা অকুণ্ঠ উদারতা আছে যে তুচ্ছ সময় অসময়ের চিন্তা উহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না।

চায়ের হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট বাহির করিল ; একটা সিগারেট ঠোঁটে ধরিয়া পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিতে করিতে বলিল, 'বীরেনবাবু যখন বলেছেন খারাপ খবর, তার মানে গুরুতর কিছু। হয়ত—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম সে বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে হস্তধৃত দেশালায়ের বাক্সটার দিকে তাকাইয়া আছে।

ব্যোমকেশ মুখ হইতে অ-জ্বালিত সিগারেট নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এ ত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি! এ দেশালায়ের বাক্স আমার পকেট কোথা থেকে এল?'

'কোন্ দেশালায়ের বাক্স?'

ব্যোমকেশ বাক্সটা আমার দিকে ফিরাইল। দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না, সাধারণ দেশালায়ের বাক্স যেমন হইয়া থাকে উহাও তেমনি কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া আছি দেখিয়া ব্যোমকেশ পূর্ব্ববৎ ধীরস্বরে বলিল, 'দেখতে পাচ্ছ বোধহয়, বাক্সটার ওপর যে লেবেল্ মারা আছে তাতে একজন সত্যাগ্রহী কুড়ুল কাঁধে করে তালগাছ কাটতে যাচ্ছে। অথচ আমাদের বাসায়—'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'বুঝেছি, ঘোড়া মার্কা ছাড়া অন্য দেশালাই আসে না।'

'ঠিক। সুতরাং আমি যখন বেরিয়েছিলুম তখন আমার পকেটে স্বভাবতই ঘোড়া মার্কা দেশালাই ছিল। ফিরে এসে দেখছি সেটা সত্যাগ্রহীতে পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্চে, আজকালকার এই স্বরাজ-সাধনার যুগেও এতটা পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় কি করে?' তারপর গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম আসিল।

‘এবার বাজার থেকে কোন্ মার্কা দেশালাই এনেছ?’

‘আজ্ঞে ঘোড়া মার্কা।’

‘কত এনেছ?

‘আজ্ঞে এক বাণ্ডিল।

‘সত্যাগ্রহী মার্কা আনো নি?’

‘আজ্ঞে না।’

‘বেশ, যাও।’

পুঁটিরাম প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেশালায়ের বাক্সটার দিকে তাকাইয়া রহিল; ভাবিতে ভাবিতে বলিল, ‘মনে পড়ছে, ট্রামে যেতে যেতে সিগারেট ধরিয়েছিলুম, তখন পাশের ভদ্রলোক দেশালাইটা চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সিগারেট ধরিয়ে সেটা ফেরৎ দিলেন, আমি না দেখেই পকেটে ফেললুম;—অজিত!’

কি?

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, ‘অজিত, সেই লোকটাই দেশালায়ের বাক্স বদলে নিয়েছে।’ দেখিলাম, তাহার মুখ হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘লোকটা কে? তার চেহারা মনে আছে?’

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, ‘না, ভাল করে দেখি নি। যতদূর মনে পড়ছে মাথায় মঙ্কিক্যাপ ছিল, আর চোখে কালো চশ্‌মা—’ ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘বীরেনবাবু কখন আসবেন বলেছেন?’

‘দশটায়।’

'তাহলে তিনি এলেন বলে। অজিত, বীরেনবাবু আজ কেন আসছেন জানো?'

'না—কেন?'

'আমার মনে হয়—আমার সন্দেহ হয়—'

এই সময় সিঁড়িতে বীরেনবাবুর ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, ব্যোমকেশ কথাটা শেষ করিল না।

বীরেনবাবু আসিয়া গম্ভীর মুখে উপবেশন করিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'নিজের দেশালাই দিয়ে ধরান। দেবকুমারবাবুর দেশালায়ের বাক্স কবে চুরি গেল?'

'পরশু'—বলিয়াই বীরেনবাবু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন—'আপনি জানলেন কোত্থেকে? একথা ত চাপা আছে, বাইরে বেরুতে দেওয়া হয় নি।'

'স্বয়ং চোর আমাকে খবর পাঠিয়েছে'—বলিয়া ব্যোমকেশ ট্রামে দেশালাই বদলের ব্যাপারটা বিবৃত করিল।

বীরেনবাবু গভীর মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, তারপর দেশালায়ের বাক্সটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সন্তর্পণে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'এর মধ্যে একটি মারাত্মক কাঠি আছে—বাপ্! লোকটা কে আপনার কিছু সন্দেহ হয় না?'

'না। তবে যেই হোক, আমাকে যে মারতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কেন? এত লোক থাকতে আপনাকেই বা মারতে চাইবে কেন?'

আমি বলিলাম, 'হয়ত সে মনে করে, ব্যোমকেশকে মারতে পারলে তাকে ধরা কঠিন হবে তাই আগেভাগেই ব্যোমকেশকে সরাতে চায়।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার তা মনে হয় না। পুলিশের

অসংখ্য কর্ম্মচারী রয়েছেন যাঁরা বুদ্ধিতে কর্ম্মদক্ষতায় আমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বীরেনবাবুর কথাই ধর না। চোরের যদি সেই উদ্দেশ্যই থাকত তাহলে সে আমাকে না মেরে বীরেনবাবুকে মারবার চেষ্টা করত!'

প্রশংসাটা কিছু মারাত্মক জাতীয় হইলেও দেখিলাম বীরেনবাবু মনে মনে খুশী হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'না—না—তবে—অন্য কি কারণ থাকতে পারে?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'সেইটেই ঠিক ধরতে পারছি না। যতদূর মনে পড়ছে আমার ব্যক্তিগত শত্রু কেউ নেই।'

বীরেনবাবু ঈষৎ বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'বলেন কি মশায়! আপনি এতদিন ধরে চোর-ছ্যাঁচড় বদ্‌মায়েসের পিছনে লেগে আছেন, আর আপনার শত্রু নেই। আমাদের পেশাই ত শত্রু তৈরী করা।'

এই সময় পুঁটিরাম চা লইয়া আসিল। একটা পেয়ালা বীরেনবাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ মৃদুহাস্যে বলিল, 'তা বটে। কিন্তু আমার অধিকাংশ শত্রুই বেঁচে নেই। যাগোক এবার বলুন ত কি করে জিনিসটা চুরি গেল?'

বীরেনবাবু চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিলেন, 'ঠিক কি করে চুরি গেল তা বলা কঠিন। আপনি ত জানেন দেশালায়ের বাক্সটা দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমায় একজিবিট্‌ ছিল, কাজেই সেটা পুলিশের তত্ত্বাবধান থেকে কোর্টের এলাকায় গিয়ে পড়েছিল। পরশু মোকদ্দমা শেষ হয়েছে, তারপর থেকে আর সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! সন্দেহের ওপর কয়েকজন আর্দ্দালি আর নিম্নতন কর্ম্মচারীকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, আর কিছু

হচ্ছে না। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে মহা হৈচৈ পড়ে গেছে, খোদ গভর্মেন্টের পর্য্যন্ত টনক নড়েছে। এখন আপনি ভরসা!'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'খাস ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট থেকে হুকুম এসেছে, চোর ধরা পড়ুক না পড়ুক, দেশালায়ের বাক্স উদ্ধার করা চাই। এর ওপর নাকি আন্তর্জ্জাতিক শান্তি নির্ভর করছে।'

'বুঝলুম। কিন্তু আমাকে যে আপনি এ কাজে ডাকছেন—এতে কর্ত্তৃপক্ষের মত আছে কি?'

'আছে। আপনাকে তাহলে সব কথা বলি। দেশালায়ের বাক্স লোপাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেস্‌টা সি আই ডি পুলিশের হাতে যায়। কিন্তু আজ তিন দিন ধরে অনুসন্ধান ক'রেও তারা কোনও হদিস বার করতে পারে নি। এদিকে প্রত্যহ তিন চার বার গভর্মেণ্টের কড়া তাগাদা আসছে। তাই শেষ পর্য্যন্ত বড়সাহেব আপনার সাহায্য তলব করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ ব্যাপারের সমাধান যদি কেউ করতে পারে ত সে আপনি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া একবার ঘরময় পায়চারি করিল, তারপর বলিল, 'তাহলে আর কোনও কথা নেই। কিন্তু—আমি একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনি যখন যাবেন তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

'বেশ—' একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আজ আর নয়, কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আজকের দিনটা আমাকে ভাব্‌তে দিতে হবে।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'কিন্তু যতই দেরী হবে—'

'সে আমি বুঝছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি যাহোক একটা কিছু করলেই ত হবে না। একটা অজানা অচেনা লোককে ধরতে হবে, অথচ এমন সূত্র

কোথাও নেই যা ধরে তার কাছে পৌঁছুতে পারা যায়। একটু বিবেচনা করে পন্থা স্থির করতে হবে না?'

'তা বটে—'

'ইতিমধ্যে যে লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে যদি কোনও স্বাকারোক্তি আদায় করতে পারেন তার চেষ্টা করুন। যদি—'

বীরেনবাবু গম্ভীর মুখে একটু হাসিলেন—'তিন দিন ধরে অনবরত সে-চেষ্টা হচ্ছে, কোনো ফল হয় নি। আপনি যদি চেষ্টা করে দেখতে চান, দেখতে পারেন।'

ব্যোমকেশ বিরসস্বরে বলিল, 'পুলিশের চেষ্টা যখন বিফল হয়েছে তখন আমি কিছু পারব মনে হয় না। তারা হয়ত নির্দ্দোষ। যাক, তাহলে ঐ কথা রইল, কাল আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব; তারপর যাহোক একটা কিছু করা যাবে। এ ব্যাপারে আমার নিজের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে, কারণ চোরমহাশয় প্রথমে আমার ওপরেই কৃপা-দৃষ্টি পাত করেছেন।'

অতঃপর আরো কিছুক্ষণ বসিয়া বীরেনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া দেশালায়ের বাক্সটা নিজের লাইব্রেরী ঘরে রাখিয়া আসিল। তারপর পিছনে হাত রাখিয়া গম্ভীর ভ্রূকুঞ্চিত মুখে ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল।

এগারোটা বাজিয়া গেলে পুঁটিরাম আসিয়া স্নানের তাগাদা দিয়া গেল, কিন্তু তাহার কথা ব্যোমকেশের কানে পৌঁছিল না। সে অন্যমনস্ক ভাবে একটা 'হুঁ' দিয়া পূর্ব্ববৎ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময় ডাক পিওন আসিল। একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, 'দেখুন ত এটা আপনার চিঠি কি না।'

ব্যোমকেশ খামের শিরোনামা দেখিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমারই। কেন বল দেখি ?'

পিওন কহিল, 'নীচের মেসে এক ভদ্রলোক বলছিলেন এটা তাঁর চিঠি।'

'সেকি! ব্যোমকেশ বক্সী আরো আছে নাকি ?'

তিনি বলিলেন, 'তাঁর নাম ব্যোমকেশ বোস।'

ব্যোমকেশ চিঠিখানা আরো ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'ও—তা হতেও পারে। বাগবাজারের মোহর দেখছি—কলকাতা থেকেই চিঠি আসছে। কিন্তু আমাকে কলকাতা থেকে খামে চিঠি কে লিখবে? যাহোক, খুলে দেখলেই বোঝা যাবে। যদি আমার না হয়—কিন্তু নীচের মেসে ব্যোমকেশ নামে আর একজন আছেন এ খবর ত জানতুম না।'

পিওন প্রস্থান করিল। ব্যোমকেশ কাগজ-কাটা ছুরি দিয়া খাম কাটিয়া চিঠি বাহির করিল, তাহার উপর চোখ বুলাইয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'আমার নয়। কোকনদ গুপ্ত—অদ্ভুত নাম—কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

ব্যোমকেশবাবু, অনেকদিন আপনার সহিত দেখা হয় নাই, কিন্তু তবু আপনার কথা ভুলিতে পারি নাই। আবার সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ হইয়া আছি। চিনিতে পারিবেন ত? কি জানি অনেকদিন পরে দেখা, হয়ত অধমকে না চিনিতেও পারেন।

আপনার কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী, আপনার কাছে আমার জীবন বিক্রীত হইয়া আছে। কিন্তু কর্ম্মের জন্য বহুকাল স্থানান্তরে ছিলাম

বলিয়া সে-ঋণের কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারি নাই। এখন ফিরিয়া আসিয়াছি, সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ

শ্রীকোকনদ গুপ্ত

চিঠিখানা পড়িয়া আমি বলিলাম, 'এ চিঠি আমাদের পড়া উচিত হয় নি। অবশ্য গোপনীয় কিছু নেই, তবু এমন আন্তরিক কথা যা আছে যা অন্যের পড়া অপরাধ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা ত বুঝছি। প্রেমিক প্রেমিকার চিঠি চুরি করে পড়ার মত এ চিঠিখানা পড়লেও মনটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি বল! চিঠি আমার কিনা যাচাই করা চাই ত। কোকনদ গুপ্ত বলে কাউকে আমি চিনি না, আর চিনলেও তার কোনও মহৎ উপকার করেছি বলে স্মরণ হচ্ছে না।'

'তাহলে যার চিঠি তাকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।'

'হাঁ। পুঁটিরামকে ডাকি।'

কিন্তু পুঁটিরাম আসিবার পূর্ব্বেই চিঠির মালিক নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচের মেসের সকল অধিবাসীর সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনা-চিনি ছিল, ইঁহাকে কিন্তু পূর্ব্বে দেখি নাই। লোকটি বেঁটে-খাটো দোহারা, বোধ করি মধ্যবয়স্ক—কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করিবার উপায় নাই। কপাল হইতে গলা পর্য্যন্ত মুখখানা পুড়িয়া, চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া এমন একটা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে যে পূর্ব্বে তাঁহার চেহারা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি একটা বিকট মুখোষ পরিয়া আছেন। মুখে গোঁফ দাড়ি নাই, এমন কি চোখের পল্লব পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে মৎস্যচক্ষুর ন্যায় অনাবৃত নিষ্পলক ভাব দেখিয়া সহসা চমকিয়া উঠিতে হয়।

ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সহজ সাধারণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া যেন রূপকথার রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি দ্বারের নিকট হইতে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'আমার নাম ব্যোমকেশ বসু। একখানা চিঠি—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আসুন। চিঠিখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলুম। আপনি এসেছেন—ভালই হল। বসুন। কিছু মনে করবেন না, নিজের মনে করে খাম খুলেছিলুম। এই নিন্।'

পত্রটা হাতে লইয়া ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তারপর বলিলেন, 'কোকনদ গুপ্ত! কৈ আমার ত—' ব্যোমকেশের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন, 'আপনার চিঠি নয়? আপনি পড়েছেন নিশ্চয়।'

অপ্রস্তুতভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'পড়েছি। নিজের মনে করে— কিন্তু পড়ে দেখলুম আমার নয়। পিওন বলেছিল বটে কিন্তু খামের ওপর 'বোস্' কথাটা এমনভাবে লেখা হয়েছে যে 'বক্সী' বলে ভুল হয়। জানেন বোধহয়, আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী?'

'জানি বৈকি। আপনি এ মেসের গৌরব; এখানে এসেই আপনার নাম শুনেছি। কিন্তু চিঠিটা আমার কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। কোকনদ গুপ্ত নামটা চেনা চেনা মনে হচ্চে বটে, তবু—, যাহোক আপনি যখন বলছেন আপনার নয় তখন আমারই হবে।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মহৎ লোকের পক্ষে উপকার করে ভুলে যাওয়াই ত স্বাভাবিক।'

'না না, তা নয়—অনেক দিনের কথা, তাই হঠাৎ মনে পড়ছে না। পরে হয়ত পড়বে।—আচ্ছা, নমস্কার।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এ মেসে কত দিন এসেছেন?'

'বেশী দিন নয়। এই ত দিন পাঁচ-সাত।'

'ও'—ব্যোমকেশ হাসিল, 'যাহোক, তবু এতদিনে একজন মিতে পাওয়া গেল। আচ্ছা নমস্কার। সময় পেলে মাঝে মাঝে আসবেন, গল্প-সল্প করা যাবে।'

ভদ্রলোক আনন্দিত ভাবে সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, চল নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক; তারপর দেশালাই চুরির মামলা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবা যাবে। অনেক ভাববার কথা আছে; যে-বনে শিকার নেই সেই বন থেকে বাঘ মেরে আনতে হবে। আচ্ছা, আমাদের এই দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুটিকে আগে কোথাও দেখেছ বলে বোধ হচ্ছে কি?'

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'না, ও-মুখ কদাচ দেখি নি। তুমি দেখেছ নাকি?'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'উঁহু। কিন্তু ওঁর চলার ভঙ্গীটা যেন পরিচিত, কোথাও দেখেছি। সম্প্রতি নয়—অনেক দিন আগে। যাকগে, এখন আর বাজে চিন্তা নয়।' বলিয়া মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে স্নানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

২

চিরদিনই লক্ষ্য করিয়াছি, চিন্তা করিবার একটা বড় রকম খোরাক পাইলে ব্যোমকেশ কেমন যেন নিশ্চল সমাহিত হইয়া যায়। তখন তাহার সহিত কথা কহিতে যাওয়া প্রাণান্তকর হইয়া উঠে; হয় কথা শুনিতে পায় না, নয়ত এমন তেরিয়া হইয়া উঠে যে হাতাহাতি না করিয়া আর উপায়ান্তর থাকে না, কিন্তু আজ দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সে যখন বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল এবং সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম—কোনও কারণে তাহার একাগ্র চিন্তার পথে বিঘ্ন হইয়াছে, চেষ্টা করিয়াও সে মনকে ঐকান্তিক চিন্তায় নিয়োজিত করিতে পারিতেছে না। তারপর সে যখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া এ ঘর ও ঘর ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ হল কি তোমার! অমন ফিজেট্ করছ কেন?

ব্যোমকেশ লজ্জিতভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'কি জানি আজ কিছুতেই মন বসাতে পারছি না, কেবলই বাজে কথা মনে আসছে—'

আমি বলিলাম, 'গুরুতর কাজ যখন হাতে রয়েছে তখন বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

ঈষৎ বিরক্তভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কি ইচ্ছে করে বাজে চিন্তা করছি? আজ সকালের ঐ চিঠিখানা—'

'কোন চিঠি?'

'আরে ঐ যে কোকনদ গুপ্ত। ঘুরে ফিরে কেবল ঐ কথাই মনে আসছে।'

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'ও চিঠিতে এমন কি আছে—'

'কিছুই নেই। তবু মনে হচ্ছে চিঠিখানা যদি আমাকেই লিখে থাকে—যদি—'

'ঠিক বুঝলুম না। চিঠির লেখককে তুমি চেনো না, আর একজন লোক সে-চিঠি নিজের বলে দাবী করছেন, তবু চিঠি তোমার হবে কি করে?'

'তা বটে—কিন্তু—চিঠির কথাগুলো তোমার মনে আছে?'

'খুব গদগদ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া তাতে ত আর কিছু ছিল না। এ নিয়ে এত দুর্ভাবনা কেন?'

'ঠিক বলেছ'—হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মস্তিষ্ককে বাজে চিন্তা করবার প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়, ক্রমে একটা বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নাঃ—এখন কেবল দেশালায়ের বাক্সই ধ্যান জ্ঞান করব। আমি লাইব্রেরীতে চললুম, চা তৈরী হলে ডেকো।' বলিয়া লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া, যেন বাজে চিন্তাকে বাহিরে রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর বিকাল কাটিয়া গেল; রাত্রি হইল। কিন্তু ব্যোমকেশের সেই অস্থির বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থা দূর হইল না। বুঝিলাম, সে এখনও কিছু স্থির করিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ ব্যোমকেশের ঠেলা খাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'কি হয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওহে একটা মৎলব মাথায় এসেছে—'

মাথার উপর লেপ চাপা দিয়া বলিলাম, 'এত রাত্রে মৎলব?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ শোনো। যে লোক দেশালাই চুরি করেছে, সেই আমাকে মারবার চেষ্টা করছে—কেমন? এখন মনে কর, আমি যদি সত্যিই—'

আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে প্রাতরাশ করিতে করিতে বলিলাম, 'কাল রাত্রে তুমি কি-সব বলছিলে, শেষ পর্য্যন্ত শুনি নি।'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে কাগজ দেখিতে দেখিতে বলিল, 'তা শুনবে কেন? কাল রাত্রে আমার মৃত্যু-সংবাদ তোমাকে দিলুম, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলে। এমন না হলে বন্ধু!'

আমি আঁৎকাইয়া উঠিলাম, 'মৃত্যু সংবাদ! মানে?'

'মানে শীঘ্রই আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তার আগে একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করা দরকার।' ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'এখন সওয়া আটটা। ন'টার সময় বেরুলেই হবে।'

'কি আবল-তাবল বকছ বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া কাগজে মন দিল। বুঝিলাম, কাল গভীর রাত্রে উত্তেজনার ঝোঁকে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল এখন আর তাহা সহজে বলিবে না। নিশ্চয় কোনও অদ্ভুত ফন্দি বাহির করিয়াছে; জানিবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। রাত্রে তাহার কথা শেষ হইবার আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়া ভাল করি নাই।

মিনিট পাঁচেক নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশকে খোঁচা দিয়া কথাটা বাহির করা যাইতে পারে কিনা ভাবিতেছি, হঠাৎ সে কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, 'একলাখ টাকা দিয়ে এক বাক্স দেশালাই কিনবে?'

'সে আবার কি?'

'একজন ভদ্রলোক বিক্রী করতে চান। এই দ্যাখ।' বলিয়া সংবাদ-পত্র আমার হাতে দিল। দেখিলাম দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝখানে ব্র্যাকেট দিয়া ঘেরা এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—

এক বাক্স দিয়াশালাই বিক্রী আছে। দাম—একলক্ষ টাকা। বাক্সে কুড়িটি কাঠি আছে; প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচ হাজার। খুচরা ক্রয় করা যাইতে পারে। ক্রয়ার্থী নিজ নাম ঠিকানা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। এই অমূল্য দ্রব্য মাত্র সাতদিন বাজারে থাকিবে, তারপর বিদেশে রপ্তানি হইবে। ক্রেতাগণ তৎপর হোন।

আমি যতক্ষণ এই বিস্ময়কর বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম ততক্ষণ ব্যোমকেশ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমি হতভম্ব মুখ তাহার পানে তুলিতেই সে বলিল, 'অতি বিচক্ষণ লোক। দেশালায়ের বাক্স চুরি করে এখন আবার সেইটেই গভর্মেণ্টকে বিক্রী করতে চান। গভর্মেণ্ট না কিনলে, জাপান কিম্বা ইটালীকে বিক্রী করবেন এ ভয়ও দেখিয়েছেন।—চল।'

'কোথায়?'

'খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা। যদিও সে সম্ভাবনা কম।'

দ্রুত জুতা জামা পরিয়া ব্যোমকেশের সহিত বাহির হইলাম।

'কালকেতু' অফিসে গিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইতে বিলম্ব হইল না। ব্যোমকেশের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'বিজ্ঞাপন বিভাগ আমার খাস এলাকায় নয়, তবু এ বিজ্ঞাপনটা সম্বন্ধে আমি জানি। ইন্সিওর করা খামখানা আমার হাতেই এসেছিল। মনেও আছে, তার কারণ এমন আশ্চর্য্য বিজ্ঞাপন আমরা কখনও পাই নি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে বিজ্ঞাপনদাতা লোকটিকে আপনি দেখেন নি?'

'না। বললুম ত, ডাকে বিজ্ঞাপনটা এসেছিল। খামের মধ্যে কুড়ি

টাকার নোট আর বিজ্ঞাপনের খসড়া ছিল। প্রেরকের নাম ছিল না। খুবই আশ্চর্য্য হয়েছিলুম; কিন্তু তখন আমাদের কাজের সময়, তাই বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারকে ডেকে খসড়া তাঁর জিম্মা করে দিই তার পর ভুলে গিয়েছি। ব্যাপার কি বলুন ত? দেশলায়ের বাক্স দেখে সন্দেহ হচ্ছে, 'গুরুতর কিছু নাকি?'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'আপনাদের কানে পৌঁছুবার মত এখনও কিছু হয় নি। আচ্ছা, প্রেরক সম্বন্ধে কোনও খবরই দিতে পারেন না? তার ঠিকানা?'

কার্য্যাধ্যক্ষ মাথা নাড়িলেন, 'খামের মধ্যে নোট আর বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

'ইন্সিওর-করা খামে বিজ্ঞাপন এসেছিল বলছেন। খামের ওপরেও প্রেরকের নাম ঠিকানা ছিল না?'

কার্য্যাধ্যক্ষ সচকিত ভাবে বলিলেন, 'ওটা ত খেয়াল করি নি। নিশ্চয় ছিল; অন্ততঃ থাকা উচিত। যতদূর জানি প্রেরকের নাম-ঠিকানা না থাকলে পোষ্ট-অফিসে রেজেষ্ট্রি চিঠি নেয় না—'

টেবলের পাশে একটা প্রকাণ্ড ওয়েষ্ট্-পেপার-বাস্কেট ছিল, অধ্যক্ষ মহাশয় হঠাৎ উঠিয়া তাহার মধ্যে হাত্ড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিজয়গর্ব্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, পেয়েছি -এই, এই নিন্।'

সাধারণ সরকারি রেজিষ্ট্রি খাম, তাহার কোণে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা রহিয়াছে—

বি কে সিংহ

১৮।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঠিকানা টুকিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের পাড়াতেই দেখছি।—এখন তাহলে উঠলুম, অকারণে বসে থেকে আপনার কাজের ক্ষতি করব না—বহু ধন্যবাদ!'

অধ্যক্ষ বলিলেন, 'ধন্যবাদের দরকার নেই; যদি নতুন খবর কিছু থাকে, আগে যেন পাই। জানেন ত, দেবকুমার বোসের কেস্ আমরাই আগে চেপেছিলুম।'

'আচ্ছা তাই হবে' বলিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

'কালকেতু' অফিস হইতে আমরা সোজা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ফিরিলাম। ১৮।১ নম্বর বাড়ীখানা দ্বিতল ও ক্ষুদ্র, রেলিংএর উপর লেপ তোষক শুকাইতেছে, ভিতর হইতে কয়েকটি ছেলেমেয়ের পড়ার গুঞ্জন আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভুল ঠিকানা। যাহোক, যখন এসেছি তখন খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক।'

ডাকাডাকি করিতে একজন চাকর বাহির হইয়া আসিল—'কাকে চান বাবু?'

'বাবু বাড়ী আছেন?'

'না।'

'এ বাড়ীতে কে থাকে?'

'দারোগাবাবু থাকেন?'

'দারোগাবাবু? নাম কি?'

'বীরেনবাবু!'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাকরটার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'ও—বুঝেছি। তোমার বাবু বাড়ী এলে বোলো ব্যোমকেশবাবু দেখা করতে এসেছিলেন।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া চলিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি বড় খুশী হয়েছ দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুশী হওয়া ছাড়া উপায় কি! লোকটি এমন প্রচণ্ড রসিক যে মহাপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্মেন্টের সঙ্গে তাঁর রসিকতা করতে বাধে না। এমন লোক যদি আমার সঙ্গে একটু তামাসা করেন তাহলে আমার খুশী না হওয়াই ত ধৃষ্টতা!—তুমি এখন বাসায় যাও, আমি অন্য কাজে চললুম। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে পরামর্শ হবে।'

হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশ লাফাইয়া একটা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

৩

সেদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ আমাকে তাহার প্ল্যান প্রকাশ করিয়া বসিল।

প্ল্যান শুনিয়া বিশেষ আশাপ্রদ বোধ হইল না; এ যেন অজ্ঞাত পুকুরে মাছের আশায় ছিপ ফেলা, চারে মাছ আসিবে কিনা কোনও স্থিরতা নাই।

আমার মন্তব্য শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সে ত বটেই, অন্ধকারে ঢিল ফেলছি, লাগবে কিনা জানি না। যদি না লাগে তখন অন্য উপায় বার করতে হবে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কমিশনার সাহেবের মত আছে?'

'আছে।'

'আমাকে কিছু করতে হবে?'

'স্রেফ মুখ বুজে থাকতে হবে, আর কিছু নয়। আমি এখনই বেরিয়ে যাব; কারণ মরতে হলে আজই মরতে হয়, একটা দেশালায়ের বাক্স আর

ক'দিন চলে? তুমি ইচ্ছে করলে কাল সকালে শ্রীরামপুরে গিয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দর্শন করতে পার।'

'ইতিমধ্যে এখানে যদি কেউ তোমার খোঁজ করে, তাকে কি বলব?'

'বলবে, আমি গোপনীয় কাজে কলকাতার বাইরে গিয়েছি, কবে ফিরব ঠিক নেই।'

'বীরেনবাবু আজ বিকেলে আসতে পারেন, তাঁকেও ঐ কথাই বলব?'

কিয়ৎকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হাঁ, তাঁকেও ঐ কথাই বলবে। মোট কথা এ সম্বন্ধে কোনও কথাই কইবে না!'

'বেশ'—মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম। বীরেনবাবু পুলিশের লোক, বিশেষত এ ব্যাপারে তিনিই এক প্রকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী; তবু তাঁহার নিকট হইতেও গোপন করিতে হইবে কেন?

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্ন যেন বুঝিতে পারিয়াই ব্যোমকেশ বলিল, 'বীরেনবাবুকে না বলার কোনও বিশেষ কারণ নেই, মামুলি সতর্কতা। বর্ত্তমানে তুমি আমি আর কমিশনার সাহেব ছাড়া এ প্ল্যানের কথা আর কেউ জানে না, অবশ্য কাল আরও কেউ কেউ জানতে পারবে। কিন্তু যতক্ষণ পারা যায় কথাটা চেপে রাখাই বাঞ্ছনীয়! চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, মন্ত্রগুলিই হচ্ছে কূটনীতির মুখবন্ধ; অতএব তুমি দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকবে।'

ব্যোমকেশ প্রস্থান করিবার আধঘণ্টা পরে বীরেনবাবু ফোন করিলেন।

'ব্যোমকেশবাবু কোথায়?'

'তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'জানি না।'

'কখন ফিরবেন ?'

'কিছুই ঠিক নেই। তিন চার দিন দেরী হতে পারে।'

'তিন চার দিন! আজ সকালে আপনারা আমার বাসায় গিয়েছিলেন কেন ?'

ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম, 'তা জানি না।'

তারের অপর প্রান্তে বীরেনবাবু একটা অসন্তোষ-সূচক শব্দ করিলেন, 'আপনি যে কিছুই জানেন না দেখছি। ব্যোমকেশবাবু কোন্ কাজে গেছেন তাও জানেন না ?'

'না।'

বীরেনবাবু সশব্দে তার কাটিয়া দিলেন।

ক্রমে চারটে বাজিল। পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিবার হুকুম দিয়া, এবার কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্ব্বদিনের পরিচিত দগ্ধানন বোসজা। তাঁহার হাতে একটি সংবাদপত্র।

তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু বেরিয়েছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

তাঁহার বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না, পূর্ব্বদিনের আমন্ত্রণ স্মরণ করিয়া গল্প-গুজব করিতে আসিয়াছিলেন। আমিও একলা বৈকালটা কি করিয়া কাটাইব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, বোসজা মহাশয়কে পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

বোসজা আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, 'আজ কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, সেইটে আপনাদের দেখাতে এনেছিলুম। হয়ত আপনাদের চোখে পড়ে নি—' কাগজটা খুলিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'দেখেছেন কি ?'

সেই বিজ্ঞাপন! বড় দ্বিধায় পড়িলাম। মিথ্যাকথা বিশ্বাস-যোগ্য করিয়া বলিতে পারি না, বলিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাই। অথচ ব্যোমকেশ চাণক্য-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মুখ বন্ধ রাখিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছে। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় বসুজা মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'পড়েছেন, অথচ ব্যোমকেশবাবু কোনও কথা প্রকাশ করতে মানা করে গেছেন—না?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, 'সম্প্রতি দেশালায়ের কাঠি নিয়ে একটা মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে। এই সেদিন দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমা শেষ হল, তাতেও দেশালাই; আবার দেখছি দেশালায়ের বাক্সের বিজ্ঞাপন—মূল্য একলক্ষ টাকা। সাধারণ লোকের মধ্যে স্বভাবতই সন্দেহ হয়, দুটোর মধ্যে কোনও যোগ আছে!' বলিয়া সপ্রশ্ন চক্ষে আমার পানে চাহিলেন।

আমি এবারও নীরব হইয়া রহিলাম। কথা কহিতে সাহস হইল না, কি জানি আবার হয়ত বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিব।

তিনি বলিলেন, 'যাক্ ও কথা, আপনি হয়ত মনে করবেন আমি আপনাদের গোপনীয় কথা বার করবার চেষ্টা করছি।' বলিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আমি হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পুঁটিরাম চা দিয়া গেল। চায়ের সঙ্গে ক্রিকেট, রাজনীতি, সাহিত্য, নানাবিধ আলোচনা হইল। দেখিলাম লোকটি বেশ মিশুক ও সদালাপী—অনেক বিষয়ে খবর রাখেন।

এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, আপনার কি করা হয়? কিছু মনে করবেন না, আমাদের দেশে প্রশ্নটা অশিষ্ট নয়।'

তিনি একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'সরকারী চাকরি করি।'

'সরকারী চাকরি?'

'হাঁ। তবে সাধারণ চাক্‌রের মত দশটা চারটে অফিস করতে হয় না। চাকরিটা একটু বিচিত্র রকমের।'

'ও—কি করতে হয়?' প্রশ্নটা ভদ্ররীতি সম্মত নয় বুঝিতেছিলাম, তবে কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না।

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'রাজ্য শাসন করবার জন্যে গভর্মেণ্টকে প্রকাশ্যে ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়, অনেক খবর রাখতে হয়; নিজের চাকরদের ওপর নজর রাখতে হয়। আমার কাজ অনেকটা ঐ ধরণের।'

বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম, 'সি আই ডি পুলিশ?'

তিনি মৃদু হাসিলেন, 'পুলিশের ওপরেও পুলিশ থাকতে পারে ত। আপনাদের এই বাসাটি দিব্যি নিরিবিলি, মেসের মধ্যে থেকেও মেসের ঝামেলা ভোগ করতে হয় না। কতদিন এখানে আছেন?'

কথা পাল্টাইয়া লইলেন দেখিয়া আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না; বলিলাম, আমি আছি বছর আষ্টেক, ব্যোমকেশ তার আগে থেকে আছে।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার মুখের এরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কয়েক বছর আগে ল্যাবরেটারীতে কাজ করিতে হঠাৎ অ্যাসিডের শিশি ভাঙিয়া মুখে পড়িয়া যায়। সেই অবধি মুখের অবস্থা এইরূপ হইয়া গিয়াছে!

অতঃপর তিনি উঠিলেন। দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আপনাদের জানাশোনা আছে। কেমন লোক বলতে পারেন?'

'কেমন লোক? তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের সূত্রে আলাপ। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে ত কিছু জানি না!'

'তাঁকে খুব লোভী বলে মনে হয় কি?'

'মাফ করবেন ব্যোমকেশবাবু, তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না।'

'ও—আচ্ছা। আজ চললুম।'

তিনি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলা আমার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল। বীরেনবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে ইনি অনুসন্ধিৎসু কেন? বীরেনবাবু কি লোভী? পুলিশের কর্ম্মচারী সাধারণত অর্থগৃধ্নু হয় শুনিয়াছি। তবে বীরেনবাবু সম্বন্ধে কখনও কোনো কাণাঘুষাও শুনি নাই! যতদূর জানি তবে এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য কি? এবং গভর্ম্মেণ্টের এই গোপন ভৃত্যটী কোন্ মৎলবে আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন?

পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই খবরের কাগজ খুলিলাম। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহা বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার সুরুতেই রহিয়াছে—

"গতকল্য বৈকালে সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীরামপুর ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে এক অজ্ঞাত ভদ্রলোক যুবকের লাস পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহে কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই। মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত। মৃতের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, সুশ্রী চেহারা, গোঁফ দাড়ি কামানো। পরিধানে বাদামী রংয়ের গরম পাঞ্জাবী ও সাদা শাল ছিল। যুবক কলিকাতা হইতে ৪—৫৩ মিঃ লোকাল ট্রেণে শ্রীরামপুরে আসিয়াছিল; পকেটে টিকিট পাওয়া গিয়াছে। যদি কেহ লাস সনাক্ত করিতে পারেন, শ্রীরামপুর হাসপাতালে অনুসন্ধান করুন।"

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম।

দ্বিতলে নামিয়া একতলার সিঁড়িতে পদার্পণ করিতে যাইব, পিছু ডাক পড়িল, 'অজিতবাবু, সকাল না হতে কোথায় চলেছেন ?'

দেখিলাম, ব্যোমকেশবাবু নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। আজ আর মিথ্যা কথা বলিতে বাধিল না, বেশ সড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিল—'যাচ্ছি ডায়মণ্ড্ হারবারে—এক বন্ধুর বাড়ী। ব্যোমকেশ কবে ফিরবে কিছু ত ঠিক নেই, দুদিন ঘুরে আসি।'

'তা বেশ। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন ?'

'কালকেতু' খানা বগলে করিয়া লইয়াছিলাম, বলিলাম, 'না, গাড়ীতে পড়তে পড়তে যাব।' বলিয়া নামিয়া গেলাম।

রাস্তায় নামিয়া শিয়ালদহের দিকে কিছুদূর হাঁটিয়া গেলাম, তারপর সেখান হইতে ট্রাম ধরিয়া হাওড়া অভিমুখে রওনা হইলাম। নূতন মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে একটা অসুবিধা এই হয় যে ধরা পড়িবার লজ্জাটা সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকে। ক্রমশ পরিপক্ক হইয়া উঠিলে বোধকরি ও দুর্ব্বলতা কাটিয়া যায়।

যাহোক, হাওড়ায় ট্রেণে চাপিয়া বেলা সাড়ে ন'টা আন্দাজ শ্রীরামপুর পৌঁছিলাম।

হাসপাতালের সম্মুখে একটি ভদ্রলোক দাড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে লাসের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অদূরে একটি ছোট কুঠরী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কুঠরীটি মূল হাসপাতাল হইতে পৃথক, সম্মুখে একজন পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে।

কাচ ও তার নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে গিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম ; ভিতরে প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে শানের মত লম্বা বেদির উপরে ব্যোমকেশ

শুইয়া আছে—তাহার পা হইতে গলা পর্য্যন্ত একটা কাপড় দিয়া ঢাকা। মুখখানা মৃত্যুর কাঠিন্যে স্থির।

আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, 'আবুহোসেন জাগো।'

ব্যোমকেশ চক্ষু খুলিল।

কতক্ষণ এইভাবে অবস্থান করছ?'

'প্রায় দু'ঘণ্টা। একটা সিগারেট পেলে বড় ভাল হত।'

'অসম্ভব। মৃত ব্যক্তি পিণ্ডি খেতে পারে শুনেছি, কিন্তু সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।'

'ঠিক জানো? মনু সংহিতায় কোনও বিধান নেই?'

'না। তারপর, কজন লোক দেখতে এল?'

'মাত্র তিনজন। স্থানীয় লোক, নিতান্তই লোফার ক্লাশের।'

'তবে?'

'এখনও হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। আজ সারাদিন আছে—কালকেও অন্তত সকাল বেলাটা পাওয়া যাবে।

'দু'দিন ধরে এইখানে পড়ে থাকবে? মনে কর যদি বিজ্ঞাপনটা তাঁর চোখে না পড়ে?'

'চোখে পড়তে বাধ্য। তিনি এখন অনবরত বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করছেন।'

'তা বটে! যাহোক, এখন আমি কি করব বল দেখি।'

তুমি এই ঘরের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে থাকো, যারা আসছে তাদের ওপরে লক্ষ্য রাখো। অবশ্য পুলিশ নজর রেখেছে; যিনি এই হতভাগ্যকে পরিদর্শন করতে আসছেন তাঁরই পিছনে গুপ্তচর লাগছে। কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। তুমি যদি কোনো চেনা লোক দেখতে পাও, তখনি এসে আমাকে খবর দেবে। আমার মুস্কিল হয়েছে চোখ খুলতে

পারছি না, কাজেই যাঁরা এখানে পায়ের ধূলো দিচ্ছেন তাঁদের শ্রীমুখ দর্শন করা হচ্চে না। মড়া যদি মিট মিট করে তাকাতে আরম্ভ করে তাহলে বিষম হৈচৈ পড়ে যাবে কিনা।'

'বেশ। আমি কাছাকাছিই রইলুম। পুলিশ আবার হাঙ্গাম করবে না ত?'

'দ্বারের প্রহরীকে চুপি চুপি নিজের পরিচয় দিয়ে যেও, তাহলে আর হাঙ্গাম হবে না। তিনি একটি বর্ণচোরা আম; দেখতে পুলিশ কনেষ্টবল বটে কিন্তু আসলে একজন সি আই ডি দারোগা।'

বাহিরে আসিয়া ছদ্মবেশী প্রহরীকে আত্মপরিচয় দিলাম; তিনি অদূরে একটা মেতির ঝাড় দেখাইয়া দিলেন। মেতির ঝাড়টি এমন যায়গায় অবস্থিত যে তাহার আড়ালে লুকাইয়া বসিলে ব্যোমকেশের কুঠুরীর দ্বার পরিষ্কার দেখা যায়, অথচ বাহির হইতে ঝোপের ভিতরে কিছু আছে কিনা বোঝা যায় না।

ঝোপের মধ্যে গিয়া বসিলাম। চারিদিক ঘেরা থাকিলেও মাথার উপর খোলা; দিব্য আরামে রোদ পোহাইতে পোহাইতে সিগারেট ধরাইলাম।

ক্রমে বেলা যত বাড়িতে লাগিল, দর্শন-অভিলাষী লোকের সংখ্যাও একটি দুইটি করিয়া বাড়িয়া চলিল। উৎসুক ভাবে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সকলেই অপরিচিত, চেহারা দেখিয়া বোধ হইল, অধিকাংশই বেকার লোক, একটা নূতন ধরণের মজা পাইয়াছে।

ক্রমে এগারোটা বাজিল, মাথার উপর সূর্য্যদেব প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা মাথায় চাপা দিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা নৈরাশ্যের ভাব ধীরে ধীরে মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে-ব্যক্তি দেশালাই চুরি করিয়াছে, সে শ্রীরামপুরে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দেখিতে আসিবে কেন? আর, যদি বা আসে, এতগুলা লোকের

মধ্যে তাহাকে দেশালাই-চোর বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইবে কিরূপে ? সত্য, সকলের পিছনেই পুলিশ লাগিবে, কিন্তু তাহাতেই বা কি সুবিধা হইতে পারে ? মনে হইল, ব্যোমকেশ বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরিতেছে।

ব্যোমকেশের ঘরের দিকে চাহিয়া এই সব কথা ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ চমক ভাঙিয়া গেল। একটি লোক দ্রুতপদে আসিয়া কুঠুরীতে প্রবেশ করিল ; বোধহয় পাঁচ সেকেণ্ড পরেই আবার বাহির হইয়া আসিল—প্রহরীর প্রশ্নে একবার মাথা নাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

লোকটি—আমাদের মেসের নূতন ব্যোমকেশবাবু। তাঁহাকে দেখিয়া এতই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম যে তিনি চলিয়া যাইবার পরও কিয়ৎকাল বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে বসিয়া রহিলাম। তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সেই ঘরের অভিমুখে ছুটিলাম।

ব্যোমকেশ বোধকরি আমার পদশব্দ শুনিয়া আবার মড়ার মত পড়িয়াছিল, আমি তাহার কাছে গিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'ওহে কে এসেছিলেন জানো ? তোমার মিতে—মেসের সেই নূতন ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ সটান উঠিয়া বসিয়া আমার পানে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইল। তারপর বেদী হইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া বলিল, 'ঠিক দেখেছ ? কোনও ভুল নেই ?'

'কোনও ভুল নেই।'

'যাঃ, এতক্ষণে হয়ত পালাল।'

ব্যোমকেশের গায়ে জামা কাপড় ছিল বটে কিন্তু জুতা পায়ে ছিল না, সেই অবস্থাতেই সে বাহিরের দিকে ছুটিল। হাসপাতালের সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তিনি তখনও সেখানে ছিলেন ; ব্যোমকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় গেল ? এখনি যে-লোকটা এসেছিল ?'

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'সেই নাকি ?'

'হ্যাঁ—তাকেই গ্রেপ্তার করতে হবে।'

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'সে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে !'

সে কলকাতা থেকে ট্যাক্সিতে এসেছিল, আবার ট্যাক্সিতে চড়ে পালিয়েছে। আমাদের মোটর-বাইকের বন্দোবস্ত করা হয় নি, তাই—'

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এর জবাবদিহি আপনি করবেন।—এস অজিত, যদি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়—হয়ত এখনও—'

কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। অগত্যা বাসে চড়িয়াই কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উনিই তাহলে ?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'হুঁ।'

'কিন্তু বুঝলে কি করে ?'

'সে অনেক কথা—পরে বলব।'

'আচ্ছা উনি অত তাড়াতাড়ি পালালেন কেন ? তুমি যদি মরে' গিয়েই থাকো—'

'উনি শিকারী বেরাল, ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বুঝেছিলেন যে ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাই চট্‌পট্‌ সরে পড়লেন।'

সাড়ে বারোটার সময় মেসে পৌঁছিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম সিঁড়ির মুখে মেসের ম্যানেজার দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যোমকেশবাবু এসেছিলেন ?'

ম্যানেজার সবিস্ময়ে নগ্নপদ ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু ? তিনি ত এই খানিকক্ষণ হল চলে গেলেন।

বাড়ী থেকে জরুরী খবর পেয়েছেন, তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। তিনিও আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনাকে নমস্কার জানিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনি যেন দুঃখ না করেন, শীগ্‌গির আবার দেখা হবে।'

৪

শিষ্টতার এই প্রবল ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর ঘর কোনটা?'

'ঐ যে পাঁচ নম্বর ঘর।'

পাঁচ নম্বর ঘরের দ্বারে তালা লাগানো ছিল, ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এর চাবি কোথায়?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আমার কাছে একটা চাবি আছে' কিন্তু—"

'খুলুন।'

চাবির থোলো পকেট হইতে বাহির করিতে করিতে ম্যানেজার উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'কি—কি হয়েছে ব্যোমকেশবাবু?'

বিশেষ কিছু নয়; যে ভদ্রলোকটি এই ঘরে ছিলেন তিনি একজন দাগী আসামী।'

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তিনি ত কিছুই নিয়ে যান নি দেখছি। বাক্স বিছানা সবই রয়েছে।'

ম্যানেজার বলিলেন, 'তিনি কেবল ছোট হ্যাণ্ড ব্যাগ আর জলের কুঁজো নিয়ে গেছেন—আর সবই রেখে গেছেন। বললেন, দু'চার দিনের মধ্যে ফিরবেন, আমিও ভাবলুম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক কথা। আপনি এবার থানার দারোগা বীরেনবাবুর কাছে খবর পাঠান—তাঁকে জানান যে চোরের সন্ধান পাওয়া গেছে, তিনি যেন শীগ্‌গির আসেন।—আমরা ততক্ষণ এই ঘরটা একবার দেখে নিই।'

ম্যানেজার প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ঘরের আসবাব-পত্রের মধ্যে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। এই মেসের প্রায় সব ঘরগুলিই বড় বড়, প্রত্যেকটিতে দুই বা তিনজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। কেবল এই পাঁচ নম্বর ঘরটি ছিল ছোট, একজনের বেশী থাকা চলিত না। ভাড়াও কিছু বেশী পড়িত, তাই ঘরটা অধিকাংশ সময় খালি পড়িয়া থাকিত। যিনি মেসে থাকিয়াও স্বাতন্ত্র্য ও নিভৃততা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে ঘরটি চমৎকার।

ঘরে গোটা দুই ট্রাঙ্ক ও বিছানা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। ব্যোমকেশ বিছানাটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'শীতের সময়, অথচ লেপ তোষক বালিস কিছুই নিয়ে যান নি। অর্থাৎ—বুঝেছ?'

'না। কি?'

'অন্যত্র আর একসেট্ বন্দোবস্ত আছে।'

ব্যোমকেশ বিছানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি আশা করছ দেশালাই বাক্সটা তিনি এই ঘরে রেখে গেছেন?'

'না—তাহলে তিনি ফিরে এলেন কেন? আমি খুঁজছি তার বর্ত্তমান ঠিকানা; যদি কোথাও কিছু পাই যা-থেকে তাঁর প্রকৃত নামধামের কিছু ইসারা পাওয়া যায়। তাঁর সত্যিকারের নাম যে ব্যোমকেশ বসু নয় এটা বোধ হয় তুমিও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ।

'মানে—কি বলে—হ্যাঁ পেরেছি বৈকি। কিন্তু 'ব্যোমকেশ' ছদ্মনাম গ্রহণ করবার উদ্দেশ্য কি?'

বিছানার উপর বসিয়া ব্যোমকেশ ঘরের এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে বলিল, 'উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা সাধন। অজিত, প্রতিহিংসার মনস্তত্ত্বটা বড় আশ্চর্য্য। তুমি গল্প-লেখক, সুতরাং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সবই জানো। তোমাকে বলাই বাহুল্য যে নেপথ্য থেকে প্রতিহিংসা সাধন করে মানুষ সুখ পায় না; প্রত্যেকটি আঘাতের সঙ্গে সে জানিয়ে দিতে চায় যে সে প্রতিহিংসা নিচ্ছে। শত্রু যদি জানতে না পারে কোথা থেকে আঘাত আসছে, তাহলে প্রতিহিংসার অর্দ্ধেক আনন্দই ব্যর্থ হয়ে যায়। ইনি তাই একেবারে আমার বুকের ওপর এসে চেপে বসেছিলেন। এটা যদি সুসভ্য বিংশশতাব্দী না হয়ে প্রস্তর-যুগ হত, তাহলে এত ছল চাতুরীর দরকার হত না, উনি একেবারে পাথরের মুগুর নিয়ে আমার মাথায় বসিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সেটা চলে না, ফাঁসি যাবার ভয় রয়েছে। মোট কথা, প্রতিহিংসার পদ্ধতিটা বদলেছে বটে কিন্তু মনস্তত্ত্বটা বদলায় নি। আজ যে উনি আমার মৃত্যু মুখখানা দেখবার জন্যে শ্রীরামপুরে ছুটেছিলেন, সেও ওই একই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে।' ব্যোমকেশ খামখেয়ালী গোছের হাসিল—'চিঠিখানার কথা মনে আছে ত, সেটা আমারই উদ্দেশ্যে লেখা এবং উনি নিজেই লিখেছিলেন। তার বাহ্য কৃতজ্ঞতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল অতি ক্রূর ইঙ্গিত। তিনি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ভাবেই লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি ভোলেন নি—ঋণ পরিশোধ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন। আমরা অবশ্য তখন চিঠির মানে ভুল বুঝেছিলুম, তবু—আমার মনে একটু খটকা লেগেছিল। তোমার বোধহয় মনে আছে।'

সেই চিঠিতে লিখিত কথাগুলা যেন এখন নূতন চক্ষে দেখিতে

পাইলাম। বলিলাম, 'মনে আছে। কিন্তু তখন কে জান্‌ত—; আচ্ছা, লোকটা তোমার কোনও পুরোনো শত্রু—না?'

'তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'লোকটা কে তা কিছু বুঝতে পারছ না?'

'বোধহয় একটু একটু পারছি। কিন্তু এখন ও কথা যাক, আগে তার বাক্সগুলো দেখি।'

একটা বাক্সের চাবি খোলাই ছিল, তাহাতে দৈনিক ব্যবহার্য্য কাপড় চোপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। অন্যটার তালা লইয়া ব্যোমকেশ দু'একবার নাড়াচাড়া করিয়া একটু চাপ দিতেই সেটাও খুলিয়া গেল। ভিতরে কয়েকটা গরম কোট পাঞ্জাবী ইত্যাদি রহিয়াছে। সেগুলা বাহির করিয়া তলায় অনুসন্ধান করিতে এক শিশি স্পিরিট-গ্যম্ ও কিছু বিনুনি-করা ক্রেপ্ চুল বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি তুলিয়া ধরিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, মুখে যার অ্যাসিড্ ছাপ মেরে দিয়েছে তাকে মাঝে মাঝে গোফ্ দাড়ি পরে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় বৈকি। এই সব পরে' সম্ভবতঃ ইনি ট্রামে আমার দেশালাই বদ্‌লে নিয়েছিলেন।'

ক্রেপ ইত্যাদি সরাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ আবার কয়েকটা জিনিস দুই হাতে বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিল, বলিল, 'কিন্তু এগুলো কি?'

মোম জামার মত খানিকটা কাপড়ে কি কতকগুলা জড়ানো রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সাবধানে সেগুলা মেঝের উপর রাখিয়া মোড়ক খুলিল। একটি আধ আউন্সের খালি শিশি, কয়েকখণ্ড শিল-মোহর করিবার লাল রংয়ের গালা ও অর্দ্ধ দগ্ধ একটি মোমবাতি রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ শিশির ছিপি খুলিয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিল, মোমবাতি ও গালা খুব মনোযোগের সহিত দেখিল। শেষে মোম জামাটা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল। দেখিলাম সাধারণ মোম জামা নয়, খুব ভাল জাতীয়

ওয়াটার-প্রুফ্ কাপড়—ঈষৎ নীলাভ এবং স্বচ্ছ—আয়তনে একটা রুমালের মত। বর্ত্তমানে তাহার একটা কোণের প্রায় সিকি ভাগ কাপড় নাই—মনে হয় কোনও কারণে ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'শিশি, গালা, মোমবাতি এবং ওয়াটার প্রুফের একত্র সমাবেশ। মানে বুঝতে পারলে?'

'না—কি মানে?'

'ওয়াটার প্রুফ্ থেকেও কিছু আন্দাজ করতে পারলে না?'

হতাশভাবে বলিলাম, 'কিচ্ছু না। তুমি কি বুঝলে?'

'সবই বুঝেছি, শুধু ভদ্রলোকের বর্ত্তমান ঠিকানা ছাড়া।—চল, এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়েছে।'

এই সময় ম্যানেজারবাবু ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'দারোগা-বাবুকে খবর দিয়েছি, তিনি এলেন বলে।'

'বেশ।—আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, আমার এই মিতেটি যখন চলে গেলেন তখন আপনি নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ গিয়েছিলুম।'

'ট্যাক্সির নম্বরটা আপনার চোখে পড়ে নি?'

মাথা নাড়িয়া ম্যানেজার বলিলেন, 'আজ্ঞে না! নীল রঙের পুরোণো ট্যাক্সি-ড্রাইভার একজন শিখ—এইটুকুই লক্ষ্য করেছিলুম।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সেসময় দোরের কাছে আর কেউ ছিল?'

ম্যানেজার ভাবিয়া বলিলেন, 'ভদ্রলোক কেউ ছিলেন বলে ত মনে পড়ছে না, তবে আপনাদের চাকর পুঁটিরাম দাওয়ায় বসেছিল। আপনারা বাসায় ছিলেন না, তাই সে বোধহয় একটু—'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম থাকা না-থাকা সমান।

সে ত আর ইংরিজি জানে না, কাজেই ট্যাক্সির নম্বর চোখে দেখলেও পড়তে পারবে না।—চল অজিত, দেড়টা বাজল, পেটও বাপান্ত করছে। ম্যানেজারবাবু, এবেলা দুটি ভাত আমাদের দিতে হবে। অবশ্য যদি অসুবিধা না হয়।'

ম্যানেজার সানন্দে বলিলেন, 'বিলক্ষণ! অসুবিধে কিসের! ব্যোমকেশবাবুর—মানে, দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু—ভাত হাঁড়িতেই আছে, তিনি ত খান নি। আপনারা স্নান করুনগে, আমি ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মন্দ ব্যবস্থা নয়। দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুর বাড়া ভাত এক নম্বর ব্যোমকেশবাবু খাবেন। দুনিয়াতে এই ব্যাপার ত হরদম চলছে—কি বল অজিত? এখন দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু কোথায় বসে কার ভাত খাচ্চেন সেইটে জান্‌তে পারলে বড় খুসী হতুম।'

* * * *

আহার তখনো শেষ হয় নাই, বীরেনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোনও রকমে অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিতেই বীরেনবাবু উঠিয়া প্রশ্ন-ব্যাকুল নেত্রে ব্যোমকেশের পানে তাকাইলেন। তাহার সমস্ত দেহ একটা জীবন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকার ধারণ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার এখনো খাওয়া হয় নি দেখছি।'

'না। খাবার জন্যে বাড়ী যাচ্ছিলুম এমন সময় আপনার ডাক পেলুম। —কি হল ব্যোমকেশবাবু? ধরেছেন তাকে?'

'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে কিছু খাবার আনিয়ে দিই।'

'খাবার দরকার নেই। তবে যদি এক পেয়ালা চা—'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ। এবং সেই সঙ্গে দুটো নিষিদ্ধ ডিম।—পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম হুকুম লইয়া প্রস্থান করিলে পর, ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে

সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। তাঁহাকে না বলিয়া এত কাজ করা হইয়াছে, ইহাতে বীরেনবাবু একটু আহত হইলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথা সম্ভব মিষ্ট করিয়া সান্ত্বনা দিল, তথাপি তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, 'আমি যদি জানতুম তাহলে সে এমন হাত-ফসকে পালাতে পারত না। এখন তাকে ধরা কঠিন হবে। এতক্ষণে সে হয়ত কলকাতা থেকে বহু দূরে চলে গেছে।'

ব্যোমকেশ মেঝের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার কিন্তু মনে হয় সে কলকাতাতেই আছে। কারণ সে মার্কা-মারা লোক, ওরকম মুখ নিয়ে মানুষ বেশী দূর পালাতে পারে না। কলকাতা সহরই তার পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'তাহলে এখন কর্ত্তব্য কি? তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে ইস্তাহার জারি করা ছাড়া আর ত কোনো পথ দেখছি না।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ওটা ত হাতেই আছে। কিন্তু তার আগে—যদি ট্যাক্সির নম্বরটা পাওয়া যেত—

ইতিমধ্যে পুঁটিরাম চা ইত্যাদি আনিয়া বীরেনবাবুর সম্মুখে রাখিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পুঁটিরাম, তোমার ইংরিজি শেখা দরকার, আজই একখানা প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক কিনে আনবে। অজিত আজ থেকে তোমাকে ইংরিজি শেখাবে।'

অবান্তর কথায় বীরেনবাবু বিস্মিত ভাবে ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'ও যদি ইংরিজি জানত তাহলে আজ কোনও হাঙ্গামই হত না।' পুঁটিরামের দ্বারের কাছে অবস্থিতি ও ট্যাক্সি দর্শনের কথা বলিয়া ব্যোমকেশ বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

পুঁটিরাম মুখের সম্মুখে মুষ্টি তুলিয়া সসম্ভ্রমে একটু কাশিল—

'আজ্ঞে—'

'কি ?'

'আজ্ঞে, ট্যাক্সির নম্বর আমি দেখেছি।'

'তা দেখেছ—কিন্তু পড়তে ত পারো নি।'

'আজ্ঞে পড়তে পেরেছি। চারের পিঠে দু'টো শূন্যি, তারপর আবার একটা চার।'

আমরা তিনজনে অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুই ইংরিজি পড়তে জানিস ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে ?'

'বাংলাতে লেখা ছিল বাবু, সেই জন্যেই ত চোখে পড়ল।'

আমরা চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—'বুঝেছি।' পুঁটিরামের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা! পুঁটিরাম, আজ থেকে তোমার মাইনে একটাকা বাড়িয়ে দিলুম।'

পুঁটিরাম সহর্ষে এবং সলজ্জে বলিল, 'আজ্ঞে বাইরের দাওয়ায় বসে ছিলুম, টেক্সিতে বাংলা লম্বর দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। তাই ত লম্বরটা মনে আছে হুজুর।'

বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি ? ট্যাক্সিতে বাংলা নম্বর এল কোত্থেকে ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বাংলা নয়—ইংরেজি নম্বরই ছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে সেটা বাংলা হয়ে পড়েছিল। বুঝলেন না ? আসলে নম্বরটা ৮০০৮, পুঁটিরাম তাকে পড়েছে ৪০০৪।'

'ও—ঃ' বীরেনবাবুর চক্ষুর্দ্বয় ও অধরোষ্ঠ কিছুক্ষণ বর্ত্তুলাকার হইয়া রহিল।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আর দেরী করে লাভ কি? বীরেনবাবু, এ ত আপনার কাজ। নীল রংয়ের গাড়ী, চালক শিখ, নম্বর ৮০০৮—খুঁজে বার করতে বেশী কষ্ট হবে না। আপনি তাহলে বেরিয়ে পড়ুন, খবরটা যত শীঘ্র পাওয়া যায় ততই ভাল।'

'আমি এখনি যাচ্চি—' বীরেনবাবু উঠিয়া এক চুমুকে চা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'সন্ধ্যের আগেই আশা করি খবর নিয়ে আসতে পারব।'

'শুধু খবর নয়, একেবারে গাড়ী ড্রাইভার সব নিয়ে হাজির হবেন। ইতিমধ্যে আমি কমিশনার সাহেবকে টেলিফোন যোগে খবরটা জানিয়ে দিই। তিনি নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

গমনোদ্যত বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আসামীর নাম বা পূর্ব্ব পরিচয় সম্বন্ধে আপনি কোনও খবর দিতে পারেন না?'

'নির্ভুল খবর এখন দিতে পারি কিনা জানি না, তবু—' এক টুকরা কাগজে একটা নম্বর লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আলিপুর জেলে এই কয়েদীর ইতিহাস খুঁজলে হয়ত কিছু পরিচয় পাবেন।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'লোকটা তাহলে দাগী?'

'আমার ত তাই মনে হয়। কাল সকালে তার খোঁজ করে নম্বরটা বার করেছিলুম, কিন্তু তার জেলের ইতিহাস পড়বার ফুরসৎ হয় নি। আপনি সরকারী লোক, এ কাজটা সহজেই পারবেন—আফিসের মারফৎ। কেমন?'

'নিশ্চয়।'

বীরেনবাবু কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

৫

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু'জনে বীরেনবাবুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ব্যোমকেশ তাহার রিভলবারটা তেল ও ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল।

আমি বলিলাম, 'বীরেনবাবু ত এখনো এলেন না।'

'এইবার আসবেন।' ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে চোখ তুলিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, লোকটার আসল নাম কি? তুমি নিশ্চয় জানো?'

'আমি ত বলেছি, এখনও ঠিক জানি না।'

'তবু আন্দাজ ত করেছ।'

'তা করেছি।'

'কে লোকটা? আমার চেনা নিশ্চয়—না?'

'শুধু চেনা নয়, তোমার একজন পুরোণো বন্ধু।'

'কি রকম?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'সেই চিঠিখানাতে 'কোকনদ গুপ্ত' নাম ছিল মনে আছে বোধ হয়। তা থেকে কিছু অনুমান করতে পার না?'

'কি অনুমান করব। 'কোকনদ গুপ্ত' ত ছদ্মনাম।'

'সেই জন্যই ত তাতে আরো বেশী করে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মানুষের সত্যিকার নামকরণ হয় সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে, অধিকাংশ স্থলেই কাণা ছেলের নাম হয় পদ্মলোচন। যেমন তোমার নাম অজিত, আমার নাম ব্যোমকেশ—আমাদের বর্ণনা হিসাবে নাম-দুটোর কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু মানুষ যখন ভেবে চিন্তে ছদ্মনাম গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে অনেক-

খানি ইঙ্গিত পূরে দেবার চেষ্টা করে। 'কোকনদ' শব্দটা তোমাকে কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে না? কোনও একটা শব্দগত সাদৃশ্য?'

আমি ভাবিয়া বলিলাম, 'কি জানি, আমি ত এক 'কোকেন' ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্য পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল, 'কোকনদের সঙ্গে কোকেনের সাদৃশ্য মোটেই কাব্যানুমোদিত নয়, তাই তোমার মন উঠ্‌ছে না—কেমন? কিন্তু—ঐ বীরেনবাবু আসছেন, সঙ্গে আর একজন। অজিত, আলোটা জ্বেলে দাও, অন্ধকার হয়ে গেছে।'

বীরেনবাবু প্রবেশ করিলেন; তাহার সঙ্গে একটি দীর্ঘাকৃতি শিখ। শিখের মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি—গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা কিঞ্চিৎ সংযত করা হইয়াছে। মাথায় বেণী। ব্যোমকেশ উভয়কে আদর করিয়া বসাইল।

কালব্যয় না করিয়া ব্যোমকেশ শিখকে প্রশ্ন আরম্ভ করিল। শিখ বলিল, আজ সকালের আরোহীকে তাহার বেশ মনে আছে। তিনি বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় তাহার ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শ্রীরামপুরে যান; সেখানে হাসপাতালের অনতিদূরে গাড়ী রাখিয়া তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন। অল্পক্ষণ পরেই আবার লৌটিয়া আসিয়া দ্রুত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন। কলিকাতায় পহুঁছিয়া তিনি এই বাসায় নামেন, তারপর সামান্য কিছু 'সামান্' লইয়া আবার গাড়ীতে আরোহণ করেন। এখান হইতে বড়বাজারের কাছাকাছি একটা স্থানে গিয়া তিনি শেষবার নামিয়া যান। তিনি ভাড়া চুকাইয়া দিয়া উপরন্তু দুইটাকা বখ্‌শিশ দিয়াছেন; ইহা হইতে শিখের ধারণা জন্মিয়াছে সে লোকটি অতিশয় সাধু ব্যক্তি।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তিনি শেষবার নেমে গিয়ে কি করলেন?'

শিখ বলিল, তাহার যতদূর মনে পড়ে তিনি একজন ঝাঁকামুটের মাথায় তাঁহার বেগ্ ও জলের সোরাহি চড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন ; কোনদিকে গিয়াছিলেন তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি তোমার গাড়ী এনেছ। সেই বাবুটিকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলে আমাদের ঠিক সেইখানে পৌঁছে দিতে পারবে?'

শিখ জানাইল যে বে-শক্ পারিবে।

তখন আমরা দুইজনে তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়া নীচে নামিলাম। নীল রংয়ের গাড়ী বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, ৮০০৮ নম্বর গাড়ীই বটে। আমরা তিনজনে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। শিখ গাড়ী চালাইয়া লইয়া চলিল।

রাত্রি হইয়াছিল। গাড়ীর অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া বীরেনবাবু হঠাৎ বলিলেন, 'আপনার কয়েদীর খোঁজ নেওয়া হয়েছিল! ইনি তিনিই বটে। মাসছয়েক হল জেল থেকে বেরিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, তাহলে আর সন্দেহ নেই। মুখ পুড়েছিল কি করে?'

'ইনি শিক্ষিত ভদ্রলোক আর বিজ্ঞানবিৎ বলে এঁকে জেল-হাসপাতালের ল্যাবরেটারীতে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। বছর দুই আগে একটা নাইট্রিক অ্যাসিডের শিশি ভেঙে নিয়ে মুখের ওপর পড়ে। বাঁচবার আশা ছিল না কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে গেলেন।'

আর কোনও কথা হইল না। মিনিট পনেরো পরে আমাদের গাড়ী এমন একটা পাড়ায় গিয়া দাড়াইল যে আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ব্যোমকেশ, একি! এ যে আমাদের—' বহুদিনের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। এই পাড়ারই একটা মেসে ব্যোমকেশের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল।*

---

* 'ব্যোমকেশের ডায়েরী'তে 'সত্যান্বেষী' গল্প দ্রষ্টব্য।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।' চালককে জিজ্ঞাসা করিল, 'এইখানেই তিনি গিয়েছিলেন ?'

চালক বলিল, 'হাঁ।'

একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা এবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি, নামবেন না ?'

'দরকার নেই। আমাদের শিকার কোথায় আছে আমি জানি।'

'তাহলে তাকে এখনি গ্রেপ্তার করা দরকার।'

ব্যোমকেশ বীরেনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'শুধু গ্রেপ্তার করলেই হবে ? দেশালায়ের বাক্সটা চাই না ?'

'না না—তা চাই বৈ কি। তাহলে কি করতে চান ?'

'আগে দেশালায়ের বাক্সটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর তাকে ধরতে চাই। চলুন, কি করতে হবে বাসায় গিয়ে বলব।'

আমরা আবার ফিরিয়া চলিলাম।

রাত্রি আটটার সময়, আমি ব্যোমকেশ ও বীরেনবাবু একটা অন্ধকার গলির মোড়ে এক ভাড়াটে গাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া বসিলাম। এইখানে একটা গাড়ীর ষ্ট্যাণ্ড্ আছে—তাই আমাদের গাড়ীটা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশগজ দূরে আমাদের সেই পুরাতন মেস। বাড়ীখানা এ কয় বৎসরে কিছুমাত্র বদ্‌লায় নাই, যেমন ছিল তেমনই আছে। কেবল দ্বিতলের মেসটা উঠিয়া গিয়াছে; উপরের সারি সারি জানালাগুলিতে কোথাও আলো নাই।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ অপেক্ষা করিবার পর আমি বলিলাম, 'আমরা ধরণা দিচ্ছি, কিন্তু উনি যদি আজ রাত্রে না বেরোন্?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেরুবেন বৈ কি। রাত্রে আহার করতে হবে ত।'

আরো কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ গাড়ীর খড়খড়ির ভিতর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়াছিল, সহসা চাপা গলায় বলিল, 'এইবার! বেরুচ্ছেন তিনি।'

আমরাও খড়খড়িতে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, একজন লোক আপাদ-মস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়া সেই বাড়ীর দরজা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তারপর একবার ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে রাস্তার দুইদিকে তাকাইয়া দ্রুতপদে দূরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না বলিলেই হয়। সে অদৃশ্য হইয়া গেলে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম।

সম্মুখের দরজায় তালা বন্ধ। ব্যোমকেশ মৃদু স্বরে বলিল, 'এদিকে এস।'

পাশের যে-দরজা দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, সে দরজাটা খোলা ছিল; আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এইখানে সরু একফালি বারান্দা, তাহাতে একটি দরজা নীচের ঘরগুলিকে উপরের সিঁড়ির সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ব্যোমকেশ পকেট হইতে একটা টর্চ্চ্ বাহির করিয়া দরজাটা দেখিল; বহুকাল অব্যবহৃত থাকায় দরজা কীটদষ্ট ও কমজোর হইয়া পড়িয়াছে। ব্যোমকেশ জোরে চাপ দিতেই হুড়্‌কা ভাঙিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ভাঙা দরজা স্বাভাবিক রূপে ভেজাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ টর্চ্চের আলো চারিদিকে ফিরাইল। ঘরটা দীর্ঘকাল অব্যবহৃত, মেঝেয় পুরু হইয়া ধূলা

পড়িয়াছে, কোণে ঝুল ও মাকড়সার জাল। ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা নয়, ওদিকে চল।'

ঘরের একটা দ্বার ভিতরের দিকে গিয়াছিল, সেটা দিয়া আমরা অন্য একটা ঘরে উপস্থিত হইলাম। এ ঘরটা আমাদের পরিচিত, বহুবার এখানে বসিয়া আড্ডা দিয়াছি। টর্চ্চের আলোয় দেখিলাম ঘরটি সম্প্রতি পরিস্কৃত হইয়াছে, একপাশে একটি তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা, মধ্যস্থলে একটি টেবল ও চেয়ার। ব্যোমকেশ ঘরটার চারিপাশে আলো ফেলিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, 'হুঁ, এই ঘরটা। বীরেনবাবু, এবার আসুন অন্ধকারে বসে গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করা যাক।'

বীরেনবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, 'দেশালায়ের বাক্সটা এই বেলা—'

'সেজন্যে ভাবনা নেই। রিভলবার আর হাতকড়া পকেটে আছে ত?'

'আছে।'

'বেশ। মনে রাখবেন, লোকটি খুব শান্ত-শিষ্ট নয়।'

আমি এবং বীরেনবাবু তক্তপোষের উপর বসিলাম, ব্যোমকেশ চেয়ারটা দখল করিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দ প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। আধঘণ্টা তখনও অতীত হয় নাই, বাহিরের দরজায় খুট করিয়া শব্দ হইল। আমরা খাড়া হইয়া বসিলাম; নিশ্বাস আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল।

অতি মৃদু পদক্ষেপ অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তার পর সহসা ঘরের আলো দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সহজ স্বরে বলিল, 'আসতে আজ্ঞা হোক অনুকূলবাবু। আমরা আপনার পুরোণো বন্ধু, তাই অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছি। কিছু মনে করবেন না।'

অনুকূল ডাক্তার—অর্থাৎ দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু—সুইচে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ তিনি কথা কহিলেন না। তাঁহার পক্ষ্মহীন চক্ষুদুটি একে একে আমাদের তিনজনকে পরিদর্শন করিল। তারপর তাঁহার বিবর্ণ বিকৃত মুখে একটা ভয়ঙ্কর হাসি দেখা দিল; তিনি দাঁতের ভিতর হইতে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু যে! সঙ্গে পুলিশ দেখছি। কি চাই? কোকেন?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া হাসিল—'না না, অত দামী জিনিস চেয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করব না। আমরা অতি সামান্য জিনিস চাই—একটা দেশালায়ের বাক্স।'

অনুকূলবাবুর অনাবৃত চক্ষুদুটা ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'দেশলায়ের বাক্স! তার মানে?'

'মানে, যে-বাক্স থেকে একটি কাঠি সম্প্রতি ট্রামে যেতে যেতে আপনি আমায় উপহার দিয়েছিলেন, তার বাকি কাঠিগুলি আমার চাই। আপনি তাদের যে মূল্য ধার্য্য করেছেন অত টাকা ত আমি দিতে পারব না, তবে আশা আছে বন্ধু-জ্ঞানে সেগুলি আপনি বিনা মূল্যেই আমায় দেবেন।'

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন বৈ কি। কিন্তু হাতটা আপনি সুইচ থেকে সরিয়ে নিন। ঘর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে আমাদের চেয়ে আপনারই বিপদ হবে বেশী। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি, দু'টি রিভলবার আপনার বুকের দিকে স্থির লক্ষ্য করে আছে।'

অনুকূলবাবু সুইচ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার মুখে পাশবিক ক্রোধ এতক্ষণে উলঙ্গ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, '(ছাপিবার যোগ্য নয়) আমার জীবনটা তুই নষ্ট করে দিয়েছিস! তোর...' অনুকূলবাবুর ঠোঁটের কোণে ফেনা গাজাইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ দুঃখিত-ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ডাক্তার, জেলখানায় থেকে তোমার ভাষাটা বড় ইয়ে হয়ে গেছে দেখছি। দেবে না তাহলে দেশালায়ের বাক্সটা?'

'না—দেব না। আমি জানি না কোথায় দেশালায়ের বাক্স আছে। তোর সাধ্য হয় খুঁজে নে—কোথাকার।'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল—'খুঁজেই নিই তাহলে। —বীরেনবাবু, আপনি সতর্ক থাকবেন।'

ব্যোমকেশ গিয়া তক্তপোষের শিয়রে দাঁড়াইল। গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজাটা সেখানে রাখা ছিল, সেটা দু'হাতে তুলিয়া লইয়া সে মেঝের উপর আছাড় মারিল। কুঁজা সশব্দে ভাঙিয়া গিয়া চারিদিকে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল।

কুঁজার ভগ্নাংশগুলির মধ্যে হইতে নীল কাপড়ে মোড়া শিশির মত একটা জিনিস তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ আলোর সম্মুখে আসিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, 'ওয়াটার-প্রুফ, শিশি, শিল-মোহর, সব ঠিক আছে—শিশিটা ভাঙেনি দেখছি।—বীরেনবাবু, দেশালাই পাওয়া গেছে—এবার চোরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।'

৬

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'এই কাহিনীর মরাল হচ্ছে—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং। পুঁটিরাম যদি দাওয়ায় বসে না থাকত এবং ট্যাক্সির নম্বরটা ৮০০৮ না হত, তাহলে আমরা অনুকূলবাবুকে পেতুম কোথায়?'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তা ত বুঝলুম, কিন্তু দেশালাই-চোর যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার কি করে হল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার সত্যান্বেষী জীবনে যতগুলি ভয়ঙ্কর শত্রু তৈরী করেছি, তার মধ্যে কেবল তিনজন বেঁচে আছে। প্রথম—পেশোয়ারী আমীর খাঁ, যে মেয়ে-চুরির ব্যবসাকে সূক্ষ্ম ললিত-কলায় পরিণত করেছিল। বিচারে পীনাল কোডের কয়েক ধারায় তার বারো বছর জেল হয়। দ্বিতীয়—পলিটিকাল দালাল কুঞ্জলাল সরকার, যে সরকারী অর্থনৈতিক গুপ্ত সংবাদ চুরি করে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করত। বছর দুই আগে তার সাত বছর শ্রীঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয়—আমাদের অনুকূল ডাক্তার। ইনি কোকেনের ব্যবসা এবং আমাকে খুন করবার চেষ্টার অপরাধে দশ বছর জেলে যান। হিসেব করে দেখছি, বর্ত্তমানে কেবল অনুকূলবাবুরই জেল থেকে বেরুবার সময় হয়েছে। সুতরাং অনুকূলবাবু ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'তা বটে। কিন্তু এই দগ্ধানন ভদ্রলোকটিই যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার হয়েছিল?'

'না। ওঁর হাঁটার ভঙ্গীটা পরিচিত মনে হয়েছিল বটে কিন্তু ওঁকে সন্দেহ করি নি। তারপর সেই কোকনদ গুপ্তর চিঠিখানা—সেটাও মনে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিল। কোকনদ নামটা এতই অস্বাভাবিক যে ছদ্মনাম বলে সন্দেহ হয়, উপরন্তু আবার 'গুপ্ত'। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করেছ, আমাদের দেশের লোক ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হলেই নামের শেষে একটা 'গুপ্ত' বসিয়ে দেয়। তাই, দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু যখন চিঠিখানা নিজের বলে স্পষ্টভাবে দাবী করতে না পেরেও নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমার মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল। কোকনদ শব্দটা কোকেনের কথাই মনে করিয়ে দেয়—তুমি ঠিক ধরেছিলে। কিন্তু তখন দু'নম্বর ব্যোমকেশ-বাবুর ওপর কোনও সন্দেহ হয় নি, তাই মনের সংশয় জোর করে সরিয়ে দিয়েছিলুম। তারপর শ্রীরামপুর হাসপাতালে তুমি

যখন বললে, উনি আমাকে দেখতে এসেছেন তখন নিমেষের মধ্যে সংশয়ের সব অন্ধকার কেটে গেল। বুঝলুম উনিই অনুকূলবাবু এবং দেশালাই-চোর।'

'উনি ব্যোমকেশ নাম গ্রহণ করে এ বাসায় উঠেছিলেন কেন?'

'আগেই বলেছি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বড় অদ্ভুত জিনিস। ঐ চিঠিখানা আমাকে দিয়ে, আমি বুঝতে পারি কি না দেখবার জন্যে উনি এত কাণ্ড করেছিলেন; আর ঐ প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়েই শ্রীরামপুরে আমার মৃত মুখ দেখতে গিয়েছিলেন। উনি জানতেন, ওঁর মুখের চেহারা এমন বদলে গেছে যে আমরা ওঁকে চিনতে পারব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'আচ্ছা, জলের কুঁজোর মধ্যে দেশালায়ের কাঠি লুকিয়ে রেখেছেন, এটা ধরলে কি করে?'

ব্যোমকেশ কহিল,'এইখানে অনুকূলবাবুর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশালায়ের কাঠি জলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে এ কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কাজেই, যদি কোনও কারণে তাঁর ঘর খানাতল্লাস হয়, জলের কুঁজোর মধ্যে কেউ তা খুঁজতে যাবে না। আমার সন্দেহ হল যখন শুনলুম, তিনি একটি হ্যাণ্ডব্যাগ আর জলের কুঁজো নিয়ে চলে গেছেন! হ্যাণ্ডব্যাগ না হয় বুঝলুম; কিন্তু জলের কুঁজো নিয়ে গেলেন কেন? শীতকালে যে-লোক লেপ বিছানা নিয়ে গেল না, সে জলের কুঁজো নিয়ে যাবে কি জন্যে? জলের কুঁজো কি এতই দরকারী? তারপর তাঁর বাক্স থেকে যখন গালা ওয়াটারপ্রুফ্ ইত্যাদি বেরুল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। কাঠিগুলি তিনি শিশিতে পুরে ওয়াটারপ্রুফ্ কাপড়ে জড়িয়ে শিলমোহর করে তাকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন, যাতে জলের মধ্যে থেকেও নষ্ট না হয়। অনুকূলবাবুর বুদ্ধি ছিল অসামান্য, কিন্তু বিপথগামী হয়ে সব নষ্ট হয়ে গেল!

পুঁটিরাম চায়ের শূন্য বাটিগুলা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম, ফার্ষ্ট বুক্ এনেছ ?'

লজ্জিতভাবে পুঁটিরাম বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। অজিত, আজ থেকেই তাহলে পুঁটিরামের 'হায়ার এডুকেশন' আরম্ভ হোক। কারণ প্রত্যেক বারই যে ৮০০৮ নম্বর ট্যাক্সীতে আসামী পালাবে এমন ত কোনো কথাই নেই।'

ব্যোমকেশ ও বরদা

১

বেশী দিনের কথা নয়, ভূতান্বেষী বরদাবাবুর সহিত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের একবার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ব্যোমকেশের মনটা স্বভাবত বহির্বিমুখ, ঘরের কোণে মাকড়সার মত জাল পাতিয়া বসিয়া থাকিতেই সে ভালবাসে। কিন্তু সেবার সে পাক্কা তিনশ মাইলের পাড়ি জমাইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিয়াছিল।

ব্যোমকেশের এক বাল্যবন্ধু বেহার প্রদেশে ডি-এস্-পি'র কাজ করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মুঙ্গেরে বদলি হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ব্যোমকেশকে নিয়মিত পত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণের অন্তরালে বোধ হয় কোনো গরজ প্রচ্ছন্ন ছিল ; নচেৎ পুলিসের ডি-এস্-পি বিনা প্রয়োজনে পুরাতন অর্দ্ধবিস্মৃত বন্ধুত্ব ঝালাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন ইহা কল্পনা করিতেও মনটা নারাজ হইয়া উঠে।

ভাদ্র মাসের শেষাশেষি ; আকাশের মেঘগুলো অপব্যয়ের প্রাচুর্য্যে ফ্যাকাশে হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন ব্যোমকেশ পুলিস-বন্ধুর পত্র পাইয়া এক রকম মরিয়া হইয়াই বলিয়া উঠিল, 'চল, মুঙ্গের ঘুরে আসা যাক।'

আমি পা বাড়াইয়াই ছিলাম। পূজার প্রাক্কালে শরতের বাতাসে এমন একটা কিছু আছে যাহা ঘরবাসী বাঙালীকে পশ্চিমের দিকে ও

প্রবাসী বাঙালীকে ঘরের দিকে নিরন্তর ঠেলিতে থাকে। সানন্দে বলিলাম, 'চল।'

যথাসময়ে মুঙ্গের ষ্টেশনে উতরিয়া দেখিলাম ডি-এস্-পি সাহেব উপস্থিত আছেন। ভদ্রলোকের নাম শশাঙ্কবাবু; আমাদেরই সমবয়স্ক হইবেন, ত্রিশের কোঠা এখনো পার হয় নাই; তবু ইহারি মধ্যে মুখে ও চালচলনে একটা বয়স্থ ভারিক্কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অধিক দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িয়া তাঁহাকে প্রবীণ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া কেল্লার মধ্যে তাঁহার সরকারি কোয়ার্টারে আনিয়া তুলিলেন।

মুঙ্গের সহরে 'কেল্লা' নামে যে স্থানটা পরিচিত তাহার কেল্লাত্ব এখন আর কিছু নাই; তবে এককালে উহা মীরকাশিমের দুর্দ্ধর্ষ দুর্গ ছিল বটে। প্রায় সিকি মাইল পরিমিত বৃত্তাকৃতি স্থান প্রাকার ও গড়খাই দিয়া ঘেরা—পশ্চিম দিকে গঙ্গা। বাহিরে যাইবার তিনটি মাত্র তোরণ দ্বার আছে। বর্ত্তমানে এই কেল্লার মধ্যে আদালত ও সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারিদের বাসস্থান, জেলখানা, বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ছাড়া সাধারণ ভদ্রলোকের বাসগৃহও দু'চারিটি আছে। সহর বাজার ও প্রকৃত লোকালয় ইহার বাহিরে; কেল্লাটা যেন রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য একটু স্বতন্ত্র অভিজাত-পল্লী।

শশাঙ্কবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া চা ও প্রাতরাশের সহযোগে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমাদের আদর অভ্যর্থনা খুবই করিলেন; কিন্তু দেখিলাম লোকটি ভারি চতুর, কথাবার্ত্তায় অতিশয় পটু। নানা অবান্তর আলোচনার ভিতর দিয়া পুরাতন বন্ধুত্বের স্মৃতির উল্লেখ করিতে করিতে মুঙ্গেরে কি কি দর্শনীয় জিনিস আছে তাহার ফিরিস্তি দিতে দিতে কখন যে অজ্ঞাতসারে তাঁহার মূল বক্তব্যে পৌঁছিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য

না করিলে ঠাহর করা যায় না। অত্যন্ত কাজের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই, বাক্যের মুন্সিয়ানার দ্বারা কাজের কথাটি এমনভাবে উত্থাপন করিতে পারেন যে কাহারো ক্ষোভ বা অসন্তোষের কারণ থাকে না।

বস্তুত আমরা তাঁহার বাসায় পৌঁছিবার আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি যে কাজের কথাটি পাড়িয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমি প্রথমটা ধরিতেই পারি নাই ; কিন্তু ব্যোমকেশের চোখে কৌতুকের একটু আভাস দেখিয়া সচেতন হইয়া উঠিলাম। শশাঙ্কবাবু তখন বলিতেছিলেন, শুধু ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ বা গরম জলের প্রস্রবণ দেখিয়েই তোমাদের নিরাশ করব না, অতীন্দ্রিয় ব্যাপার যদি দেখতে চাও তাও দেখাতে পারি। সম্প্রতি সহরে একটি রহস্যময় ভূতের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁকে নিয়ে কিছু বিব্রত আছি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভূতের পেছনে বিব্রত থাকাও কি তোমাদের একটা কর্ত্তব্য নাকি ?'

শশাঙ্কবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আরে না না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে—! হয়েছে কি, মাস ছয়েক আগে এই কেল্লার মধ্যেই একটি ভদ্রলোকের ভারী রহস্যময়ভাবে মৃত্যু হয়। এখনো সে-মৃত্যুর কিনারা হয় নি, কিন্তু এরি মধ্যে তাঁর প্রেতাত্মা তাঁর পুরোণো বাড়ীতে হানা দিতে আরম্ভ করেছে।'

ব্যোমকেশ শূন্য চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিল ; দেখিলাম তাহার চোখের ভিতর গভীর কৌতুক ক্রীড়া করিতেছে। সে সযত্নে রুমাল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর একটি সিগারেট ধরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'শশাঙ্ক, তোমার কথা বলবার ভঙ্গীটি আগেকার মতই চমৎকার আছে দেখছি, এবং সদা-ব্যবহারে আরো পরিমার্জ্জিত হয়েছে। এখনো এক ঘণ্টা হয় নি মুঙ্গেরে পা দিয়েছি, কিন্তু এরি মধ্যে তোমার কথা শুনে স্থানীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি।—ঘটনাটা কি, খুলে বল।'

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। শশাঙ্কবাবু ব্যোমকেশের ইঙ্গিতটা বুঝিলেন এবং বোধ করি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া কিছুই ধরা গেল না। সহজভাবে বলিলেন, 'আর এক পেয়ালা চা? নেবে না? পান নাও। নিন্ অজিতবাবু? আচ্ছা—ঘটনাটা বলি তাহলে; যদিও এমন কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী নয়। ছ'মাস আগেকার ঘটনা—'

শশাঙ্কবাবু জর্দ্দা ও পান মুখে দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'এই কেল্লার মধ্যেই দক্ষিণ ফটকের দিকে একটি বাড়ী আছে। বাড়ীটি ছোট হলেও দোতলা, চারিদিকে একটু ফাঁকা জায়গা আছে। কেল্লার মধ্যে সব বাড়ীই বেশ ফাঁকা—সহরের মত ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি নেই; প্রত্যেক বাড়ীরই কম্পাউণ্ড আছে। এই বাড়ীটির মালিক স্থানীয় একজন 'রইস'—তিনি বাড়ীটি ভাড়া দিয়ে থাকেন।

'গত পনেরো বছর ধরে এই বাড়ীতে যিনি বাস করছিলেন তাঁর নাম—বৈকুণ্ঠ দাস। লোকটির বয়স হয়েছিল—জাতিতে স্বর্ণকার। বাজারে একটি সোনারূপার দোকান ছিল; কিন্তু দোকানটা নামমাত্র। তাঁর আসল কারবার ছিল জহরতের। হিসাবের খাতাপত্র থেকে দেখা যায়, মৃত্যুকালে তাঁর কাছে একান্নখানা হীরা মুক্তা চুনী পান্না ছিল—যার দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা!

'এই সব দামী মণি-মুক্তা তিনি বাড়ীতেই রাখতেন—দোকানে রাখতেন না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে তাঁর বাড়ীতে একটা লোহার সিন্দুক পর্য্যন্ত ছিল না। কোথায় তিনি তাঁর মূল্যবান মণিমুক্তা রাখতেন কেউ জানে না। খরিদ্দার এলে তাকে তিনি বাড়ীতে নিয়ে আসতেন, তারপর খরিদ্দারকে বাইরের ঘরে বসিয়ে নিজে ওপরে গিয়ে শোবার ঘর থেকে প্রয়োজন মত জিনিস এনে দেখাতেন।

'হীরা জহরতের বহর দেখেই বুঝতে পারছ লোকটি বড় মানুষ। কিন্তু তাঁর চাল-চলন দেখে কেউ তা সন্দেহ করতে পারত না। নিতান্ত নিরীহ গোছের আধা-বয়সী লোক, দেব দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি, গলায় তুলসী-কণ্ঠি—সর্ব্বদাই জোড়-হস্ত হয়ে থাকতেন। কিন্তু কোন সৎকার্য্যের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে এত বেশী বিমর্ষ এবং কাতর হয়ে পড়তেন যে সহরের ছেলেরা তাঁর কাছে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা ছেড়েই দিয়েছিল। তাঁর নামটাও এই সূত্রে একটু বিকৃত হয়ে পরিহাসচ্ছলে 'ব্যয়-কুণ্ঠ' আকার ধারণ করেছিল। সহর-সুদ্ধ বাঙালী তাঁকে ব্যয়-কুণ্ঠ জহুরী বলেই উল্লেখ করত।

'বাস্তবিক লোকটি অসাধারণ কৃপণ ছিলেন। মাসে সত্তর টাকা তাঁর খরচ ছিল, তার মধ্যে চল্লিশ টাকা বাড়ী ভাড়া। বাকি ত্রিশ টাকায় নিজের, একটি মেয়ের আর এক হাবাকালা চাকরের গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে নিতেন; আমি তার দৈনন্দিন খরচের খাতা দেখেছি, কখনও সত্তরের কোঠা পেরোয় নি। আশ্চর্য্য নয়?—আমি ভাবি, লোকটি যখন এতবড় কৃপণই ছিল তখন এত বেশী ভাড়া দিয়ে কেল্লার মধ্যে থাকবার কারণ কি? কেল্লার বাইরে থাকলে ত ঢের কম ভাড়ায় থাকতে পারত।'

ব্যোমকেশ ডেক-চেয়ারে লম্বা হইয়া অদূরের পাষাণ-নির্ম্মিত দুর্গ-তোরণের পানে তাকাইয়া শুনিতেছিল; বলিল, 'কেল্লার ভিতরটা বাইরের চাইতে নিশ্চয় বেশী নিরাপদ, চোর-বদ্‌মাসের আনাগোনা কম। সুতরাং যার কাছে আড়াই লক্ষ টাকার জহরৎ আছে সে ত নিরাপদ স্থান দেখেই বাড়ী নেবে। বৈকুণ্ঠবাবু ব্যয়-কুণ্ঠ ছিলেন বটে কিন্তু অসাবধানী লোক বোধ হয় ছিলেন না।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। কিন্তু কেল্লার মধ্যে থেকেও বৈকুণ্ঠবাবু যে চোরের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারেন নি সেই গল্পই বলছি। সম্ভবত তাঁর বাড়ীতে চুরি করবার সঙ্কল্প

অনেকদিন থেকেই চলছিল। মুঙ্গের জায়গাটি ছোট বটে তাই বলে তাকে তুচ্ছ মনে কোরো না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, সে কি কথা!'

'এখানে এমন দু' চারটি মহাপুরুষ আছেন যাঁদের সমকক্ষ চৌকশ চোর দাগাবাজ খুনে তোমাদের কলকাতাতেও পাবে না। বলব কি তোমাকে, গভর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে হে। এখানে মীরকাশেমের আমলের অনেক দিশী বন্দুকের কারখানা আছে জান ত? কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে, আগে বৈকুণ্ঠ জহুরীর গল্পটাই বলি।'

এইভাবে সামান্য অবান্তর কথার ভিতর দিয়া শশাঙ্কবাবু পুলিসের তথা নিজের বিবিধ গুরুতর দায়িত্বের একটা গূঢ় ইঙ্গিত দিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'গত ছাব্বিশে এপ্রিল—অর্থাৎ বাংলার ১২ই বৈশাখ—বৈকুণ্ঠবাবু আটটার সময় তাঁর দোকান থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। নিতান্তই সহজ মানুষ, মনে আসন্ন দুর্ঘটনার পূর্ব্বাভাস পর্য্যন্ত নেই। আহারাদি করে রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় তিনি দোতালার ঘরে শুতে গেলেন। তাঁর মেয়ে নীচের তলায় ঠাকুর ঘরে শুতো, সেও বাপকে খাইয়ে দাইয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলে। হাবাকালা চাকরটা রাত্রে দোকান পাহারা দিত, মালিক বাড়ী ফেরবার পরই সে চলে গেল। তারপর বাড়ীতে কি ঘটেছে, কেউ কিছু জানে না!

'সকালবেলা যখন দেখা গেল যে বৈকুণ্ঠবাবু ঘরের দোর খুলছেন না, তখন দোর ভেঙে ফেলা হল। পুলিস ঘরে ঢুকে দেখলে বৈকুণ্ঠবাবুর মৃতদেহ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোথাও তাঁর গায়ে আঘাত চিহ্ন নেই, আততায়ী গলা টিপে তাঁকে মেরেছে; তারপর তাঁর সমস্ত জহরৎ নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে প্রস্থান করেছে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আততায়ী তাহলে জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল ?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'তাই ত মনে হয়। ঘরের একটি মাত্র দরজা বন্ধ ছিল, সুতরাং জানলা ছাড়া ঢোকবার আর পথ কোথায়! আমার বিশ্বাস, বৈকুণ্ঠবাবু রাত্রে জানলা খুলে শুয়েছিলেন ; গ্রীষ্মকাল—সে-রাত্রিটা গরমও ছিল খুব। জানলার গরাদ নেই, কাজেই মই লাগিয়ে চোরেরা সহজেই ঘরে ঢুকতে পেরেছিল।

'বৈকুণ্ঠবাবুর হীরা জহরৎ সবই চুরি গিয়েছিল ?'

'সমস্ত। আড়াই লক্ষ টাকার জহরৎ একেবারে লোপাট। একটিও পাওয়া যায় নি! এমন কি তাঁর কাঠের হাত-বাক্সে যে টাকা-পয়সা ছিল তাও চোরেরা ফেলে যায় নি—সমস্ত নিয়ে গিয়েছিল।'

'কাঠের হাত-বাক্সে বৈকুণ্ঠবাবু হীরা জহরৎ রাখতেন ?

'তা ছাড়া রাখবার জায়গা কৈ ? অবশ্য হাত-বাক্সেই যে রাখতেন তার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর শোবার ঘরে কারু ঢোকবারই হুকুম ছিল না, মেয়ে পর্য্যন্ত জানত না তিনি কোথায় কি রাখেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর একটা লোহার সিন্দুক পর্য্যন্ত ছিল না ; অথচ হীরা মুক্তা যা-কিছু সব শোবার ঘরেই রাখতেন। সুতরাং হাত-বাক্সেই সেগুলো থাকত, ধরে নিতে হবে।'

'ঘরে আর কোনো বাক্স-প্যাঁট্‌রা বা ঐ ধরণের কিছু ছিল না ?'

'কিছু না। শুনলে আশ্চর্য্য হবে, ঘরে একটা মাদুর, একটা বালিশ, ঐ হাত-বাক্সটা, পাণের বাটা আর জলের কলসী ছাড়া কিছু ছিল না। দেয়ালে একটা ছবি পর্য্যন্ত না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাণের বাটা! সেটা ভাল করে দেখেছিলে ত ?'

শশাঙ্কবাবু ক্ষুব্ধভাবে ঈষৎ হাসিলেন—'ওহে, তোমরা আমাদের যতটা

গাধা মনে কর, সত্যিই আমরা ততটা গাধা নই। ঘরের সমস্ত জিনিসই আতি-পাতি করে তল্লাস করা হয়েছিল। পাণের বাটার মধ্যে ছিল একদলা চূণ, খানিকটা করে খয়ের সুপুরি লবঙ্গ—আর পাণের পাতা। বাটাটা পিতলের তৈরী, তাতে চূণ খয়ের সুপুরির জন্য আলাদা খুব্রি কাটা ছিল। বৈকুণ্ঠবাবু খুব বেশী পাণ খেতেন, অন্যের সাজা পাণ পছন্দ হত না বলে নিজে সেজে খেতেন।—আর কিছু জানতে চাও এ সম্বন্ধে?'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না না, ওই যথেষ্ট। তোমাদের ধৈর্য্য আর অধ্যবসায় সম্বন্ধে ত কোনো প্রশ্ন নেই; সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। সেই সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধি—কিন্তু সে যাক। মোট কথা দাঁড়াল এই যে বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে তাঁর আড়াই লক্ষ টাকার জহরৎ নিয়ে চোর কিম্বা চোরেরা চম্পট দিয়েছে। তার পর ছ'মাস কেটে গেছে কিন্তু তোমরা কোনো কিনারা করতে পারো নি। জহরৎগুলো বাজারে চালাবার চেষ্টা হচ্চে কি না—সে খবর পেয়েছ?'

'এখনো জহরৎ বাজারে আসে নি। এলে আমরা খবর পেতুম। চারিদিকে গোয়েন্দা আছে।'

'বেশ। তার পর?'

'তার পর আর কি—ঐ পর্য্যন্ত। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তিনি নগদ টাকা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি; কোথাও একটি পয়সা পর্য্যন্ত ছিল না। দোকানের সোনা-রূপো বিক্রী করে যা সামান্য দু'-চার টাকা পেয়েছে সেইটুকুই সম্বল। বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ে, বিদেশে পয়সার অভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে রয়েছে দেখলেও কষ্ট হয়।'

'কার গলগ্রহ হয়ে আছে?'

'স্থানীয় একজন প্রবীণ উকিল—নাম তারাশঙ্করবাবু। তিনিই নিজের

বাড়ীতে রেখেছেন। লোকটি উকিল হলেও ভাল বলতে হবে। বৈকুণ্ঠ-বাবুর সঙ্গে প্রণয়ও ছিল, প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা দুজনে দাবা খেলতেন—'

'হুঁ। মেয়েটি বিধবা?'

'না সধবা। তবে বিধবা বললেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীটা অল্প বয়সে বয়াটে হয়ে যায়। মাতাল দুশ্চরিত্র—থিয়েটার যাত্রা করে বেড়াত, তারপর হঠাৎ নাকি এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়। সেই থেকে নিরুদ্দেশ। তাই মেয়েকে বৈকুণ্ঠবাবু নিজের কাছেই রেখেছিলেন।'

'মেয়েটির বয়স কত?'

'তেইশ-চব্বিশ হবে।'

'চরিত্র কেমন?'

'যতদূর জানি, ভাল। চেহারাও ভাল থাকার অনুকূল—অর্থাৎ জলার পেত্নী বললেই হয়। স্বামী বেচারাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না—'

'বুঝেছি! দেশে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

'না-থাকারই মধ্যে। নবদ্বীপে খুড়তুত জ্যাঠ্‌তুত ভায়েরা আছে, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কয়েকজন ছুটে এসেছিল। কিন্তু যখন দেখলে এক ফোঁটাও রস নেই, সব চোরে নিয়ে গেছে, তখন যে-যার খসে পড়ল।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি অভিনবত্ব রয়েছে। কিন্তু এত বেশী দেরি হয়ে গেছে যে আর কিছু করতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমি বিদেশী, দু'দিনের জন্য এসেছি, তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তুমিও বোধ হয় তা পছন্দ করবে না।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'না না, হস্তক্ষেপ করতে যাবে কেন? আমি অফিশিয়ালি তোমাকে কিছু বলছি না; তবে তুমিও এই কাজের কাজি, যদি দেখে শুনে তোমার মনে কোনো আইডিয়া আসে তা'হলে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে পার। তুমি বেড়াতে এসেছ, তোমার ওপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে আমি চাই না।'

শশাঙ্কবাবুর মনের ভাবটা অজ্ঞাত রহিল না। সাহায্য লইতে তিনি পুরাদস্তুর রাজি, কিন্তু 'অফিশিয়ালি' কাহারো কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া যশের ভাগ দিতে নারাজ।

ব্যোমকেশও হাসিল, বলিল, 'বেশ, তাই হবে। দায়িত্ব না নিয়েই তোমাকে সাহায্য করব।—ভাল কথা, ভূতের উপদ্রবের কথা কি বলছিলে?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার কিছুদিন পরে ঐ বাড়ীতে আর একজন বাঙালী ভাড়াটে এসেছেন, তিনি আসার পর থেকেই বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। সব কথা অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু যে সব ব্যাপার ঘটছে তাতে রোমাঞ্চ হয়। পনেরো হাত লম্বা একটি প্রেতাত্মা রাত্রে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারে। বাড়ীর লোক ছাড়াও আরো কেউ কেউ দেখেছে।'

'বল কি?'

'হ্যাঁ।—এখানে বরদাবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন—আরে! নাম করতে না করতেই এসে পড়েছেন যে! অনেকদিন বাঁচবেন। শৈলেনবাবুও আছেন—বেশ বেশ। আসুন। ব্যোমকেশ, বরদাবাবু হচ্ছেন ভূতের একজন বিশেষজ্ঞ। ভূতুড়ে ব্যাপার ওঁর মুখেই শোনো।'

২

প্রাথমিক নমস্কারাদির পর নবাগত দুইজন আসন গ্রহণ করিলেন। বরদাবাবুর চেহারাটি গোল-গাল বেঁটে-খাটো, রং ফর্‌সা, দাড়ি গোঁফ কামানো ; সব মিলাইয়া নৈনিতাল আলুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার সঙ্গী শৈলেনবাবু ইহার বিপরীত ; লম্বা একহারা গঠন, অথচ ক্ষীণ বলা চলে না। কথায় বার্ত্তায় উভয়ের পরিচয় জানিতে পারিলাম। বরদাবাবু এখানকার বাসিন্দা, পৈতৃক কিছু জমিজমা ও কয়েকখানা বাড়ীর উপস্বত্ব ভোগ করেন এবং অবসরকালে প্রেততত্ত্বের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। শৈলেনবাবু ধনী ব্যক্তি—স্বাস্থ্যের জন্য মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানটি তাঁহার স্বাস্থ্যের সহিত এমন খাপ খাইয়া গিয়াছে যে বাড়ী কিনিয়া এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বয়স উভয়েরই চল্লিশের নীচে।

আমাদের পরিচয়ও তাঁহাদিগকে দিলাম—কিন্তু দেখা গেল ব্যোমকেশের নাম পর্য্যন্ত তাঁহারা শোনেন নাই। খ্যাতি এমনই জিনিস।

যা'হোক, পরিচয় আদান-প্রদানের পর বরদাবাবু বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠ জহুরীর গল্প শুনছিলেন বুঝি ? বড়ই শোচনীয় ব্যাপার—অপঘাত মৃত্যু। আমার বিশ্বাস গয়ায় পিণ্ড না দিলে তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হবে না।'

ব্যোমকেশ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনি প্রেত-যোনি বিশ্বাস করেন না ?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'অবিশ্বাসও করি না। প্রেত-যোনি আমার হিসেবের বাইরে।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনি হিসেবের বাইরে রাখতে চাইলেও তারা

যে থাকতে চায় না। ঐখানেই ত মুস্কিল। শৈলেনবাবু, আপনিও ত আগে ভূত বিশ্বাস করতেন না, বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এখন?'

বরদাবাবুর সঙ্গী বলিলেন,'এখন গোড়াভক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক ব্যোমকেশবাবু, আগে আমিও আপনার মত ছিলুম, ভূত-প্রেত নিয়ে মাথা ঘামাতুম না। কিন্তু এখানে এসে বরদাবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর যতই এ বিষয়ে আলোচনা করছি ততই আমার ধারণা হচ্ছে যে ভূতকে বাদ দিয়ে এ সংসারে চলা একরকম অসম্ভব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি জানি! আমাদের ত এখন পর্য্যন্ত বেশ চলে যাচ্ছে। আর দেখুন, এমনিতেই মানুষের জীবন-যাত্রাটা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে তার ওপর আবার—'

শশাঙ্কবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, 'ও সব যাক। বরদাবাবু, আপনি ব্যোমকেশকে বৈকুণ্ঠবাবুর ভূতুড়ে কাহিনীটা শুনিয়ে দিন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। তত্ত্ব-আলোচনার চেয়ে গল্প শোনা ঢের বেশী আরামের।'

বরদাবাবুর মুখে তৃপ্তির একটা ঝিলিক খেলিয়া গেল। জগতে গল্প বলিবার লোক অনেক আছে—কিন্তু অনুরাগী শ্রোতা সকলের ভাগ্যে জোটে না। অধিকাংশই অবিশ্বাসী ও ছিদ্রান্বেষী, গল্প শোনার চেয়ে তর্ক করিতেই অধিক ভালবাসে। তাই ব্যোমকেশ যখন তত্ত্ব ছাড়িয়া গল্প শুনিতেই সম্মত হইল তখন বরদাবাবু যেন অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বুঝিলাম, শিষ্ট এবং ধৈর্য্যবান শ্রোতা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

শশাঙ্কবাবুর কৌটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ-পূর্ব্বক বরদাবাবু ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের গল্প

বলিবার ভঙ্গী এক নয় ; বরদাবাবুর ভঙ্গীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ি নাই—ধীরমন্থর তালে চলিয়াছে ; ঘটনার বাহুল্যে গল্প কণ্টকিত নয়, অথচ এরূপ নিপুণভাবে ঘটনাগুলি বিন্যস্ত যে শ্রোতার মনকে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলে। চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভঙ্গিমা এমনভাবে গল্পের সহিত সঙ্গত করিয়া চলে যে সব মিশাইয়া একটি অখণ্ড রসবস্তুর আস্বাদ পাইতেছি বলিয়া ভ্রম হয়।

—'বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর কথা আপনারা শুনেছেন। অপঘাত মৃত্যু ; পরলোকের জন্য প্রস্তুত হবার অবকাশ তিনি পান নি। আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, মানুষের আত্মা সহসা অতর্কিতভাবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার দেহাভিমান দূর হয় না—অর্থাৎ সে বুঝতেই পারে না যে তার দেহ নাই। আবার কখনো কখনো বুঝতে পারলেও সংসারের মোহ ভুলতে পারে না, ঘুরে ফিরে তার জীবিতকালের কর্ম্মক্ষেত্রে আনাগোনা ক'রতে থাকে।

'এসব থিয়োরি আপনাদের বিশ্বাস ক'রতে বলছি না। কিন্তু যে অলৌকিক কাহিনী আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি—এ ছাড়া তার আর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ঘটনা যে সত্য সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আমি আষাঢ়ে গল্প বলি এই রকম একটা অপবাদ আছে ; কিন্তু এক্ষেত্রে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে আমি একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। কি বলেন শৈলেনবাবু?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। অমূল্যবাবুকেও স্বীকার ক'রতে হয়েছে যে ঘটনা মিথ্যে নয়।'

বরদাবাবু বলিতে লাগিলেন, 'সুতরাং কারণ যাই হোক, ঘটনাটা নিঃসংশয়। বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর কয়েক হপ্তা তাঁর বাড়ীখানা পুলিশের কবলে রইল ; ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে তারাশঙ্করবাবু

নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। এ কয়দিনের মধ্যে কিছু ঘটেছিল কি না ব'লতে পারি না, পুলিশের যে দু'জন কনষ্টেবল সেখানে পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন হয়েছিল তারা সম্ভবত সন্ধ্যের পর দু'ঘটি ভাঙ্ চড়িয়ে এমন নিদ্রা দিত যে ভূত-প্রেতের মত অশরীরী জীবের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রবার মত অবস্থা তাদের থাকত না। যা হোক, পুলিশ সেখান থেকে থানা তুলে নেবার পরই একজন নবাগত ভাড়াটে বাড়ীতে এলেন। ভদ্রলোকের নাম কৈলাসচন্দ্র মল্লিক—রোগজীর্ণ বৃদ্ধ—স্বাস্থ্যের অন্বেষণে মুঙ্গেরে এসে কেল্লায় একখানা বাড়ী খালি হয়েছে দেখে খোঁজখবর না নিয়েই বাড়ী দখল করে ব'সলেন—বাড়ীর মালিকও খুনের ইতিহাস তাঁকে জানাবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না।

'কয়েকদিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। দোতলায় একটি মাত্র শোবার ঘর—যে-ঘরে বৈকুণ্ঠবাবু মারা গিয়েছিলেন—সেই ঘরটিতেই কৈলাসবাবু শুতে লাগলেন। নীচের তলায় তাঁর চাকর বামুন সরকার রইল। কৈলাসবাবুর অবস্থা বেশ ভাল, পাড়াগেঁয়ে জমিদার। একমাত্র ছেলের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, স্ত্রীও জীবিত নেই—তাই কেবল চাকর বামুনের ওপর নির্ভর করেই হাওয়া বদলাতে এসেছেন।

ছয় সাত দিন কেটে যাবার পর একদিন ভূতের আবির্ভাব হল। রাত্রি নটার সময় ওষুধ-খেয়ে তিনি নিদ্রার আয়োজন করছেন, এমন সময় নজর প'ড়ল জানালার দিকে। গ্রীষ্মকাল, জানালা খোলাই ছিল—দেখলেন, কদাকার একখানা মুখ ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে। কৈলাসবাবু চীৎকার করে উঠলেন, চাকর-বাকর নীচে থেকে ছুটে এল। কিন্তু মুখখানা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'তারপর আরো দুই রাত্রি ওই ব্যাপার হল। প্রথম রাত্রির ব্যাপারটা রুগ্ন কৈলাসবাবুর মানসিক ভ্রান্তি বলে সকলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা

করেছিল কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হল না। খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের সঙ্গে তখনো কৈলাসবাবুর আলাপ হয় নি, কিন্তু আমরাও জানতে পারলুম।

'ভূত-প্রেত সম্বন্ধে আমার একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আছে। নেই বলে আমি তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না, আবার চোখ বুজে তাকে মেনে নিতেও পারি না। তাই, অন্য সকলে যখন ঘটনাটাকে পরিহাসের একটি সরস উপাদান মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌লেন, আমি তখন ভাবলুম--- দেখিই না ; অপ্রাকৃত বিষয় বলে মিথ্যেই হতে হবে এমন কি মানে আছে?

'একদিন আমি এবং আরো কয়েকজন বন্ধু কৈলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি রোগে পঙ্গু---হার্টের ব্যারাম---নীচে নামা ডাক্তারের নিষেধ ; তাঁর শোবার ঘরেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। খিট্‌খিটে স্বভাবের লোক হলেও তাঁর বাহ্য আদব-কায়দা বেশ দুরস্ত, আমাদের ভাল ভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর কাছ থেকে ভৌতিক ব্যাপারের সঠিক বিবরণ পাওয়া গেল।

'তিনি ব'ললেন---গত পনেরো দিনের মধ্যে চারবার প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়েছে ; চারবারই সে জানালার সামনে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছে---তারপর মিলিয়ে গেছে। তার আসার সময়ের কিছু ঠিক নেই ; কখনো দুপুর রাত্রে এসেছে, কখনো শেষ রাত্রে এসেছে, আবার কখনো বা সন্ধ্যের সময়েও দেখা দিয়েছে। মূর্ত্তিটা সুশ্রী নয়, চোখে একটা লুব্ধ ক্ষুধিত ভাব। যেন ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু মানুষ আছে দেখে সাক্ষাতে ফিরে চলে যাচ্চে।

'কৈলাসবাবুর গল্প শুনে আমরা স্থির করলুম, স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে। কৈলাসবাবুও আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ ক'রলেন। পরদিন থেকে আমরা প্রত্যহ তাঁর বাড়ীতে পাহারা আরম্ভ করলুম। সন্ধ্যে

থেকে রাত্রি দশটা—কখনো বা এগারোটা বেজে যায়। কিন্তু প্রেতযোনির দেখা নেই। যদি বা কদাচিৎ আসে, আমরা চলে যাবার পর আসে; আমরা দেখতে পাই না।

'দিন দশেক আনাগোনা করবার পর আমার বন্ধুরা একে একে খসে পড়তে লাগলেন; শৈলেনবাবুও ভগ্নোদ্যম হয়ে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। আমি কেবল একলা লেগে রইলুম। সন্ধ্যের পর যাই, কৈলাসবাবুর সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করি, তারপর সাড়ে-দশটা এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।

'এইভাবে আরো এক হপ্তা কেটে গেল। আমিও ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়তে লাগলুম। এ কি রকম প্রেতাত্মা যে কৈলাসবাবু ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। কৈলাসবাবুর ওপর নানা রকম সন্দেহ হ'তে লাগল।

'তারপর একদিন হঠাৎ আমার দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পুরস্কার পেলুম। কৈলাসবাবুর ওপরে সন্দেহও ঘুচে গেল।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ একমনে শুনিতেছিল, বলিল, 'আপনি দেখলেন?'

গম্ভীর স্বরে বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—আমি দেখলুম।'

ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল।—'তাই ত!' তারপর কিয়ৎকাল যেন চিন্তা করিয়া বলিল, 'বৈকুণ্ঠবাবুকে চিনতে পারলেন?'

বরদাবাবু মাথা নাড়িলেন—'তা ঠিক বলতে পারি না।—একখানা মুখ, খুব স্পষ্ট নয়—তবু মানুষের মুখ তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আবছায়া ছবির মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি আশ্চর্য্য! প্রত্যক্ষভাবে ভূত দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না; অধিকাংশ স্থলেই ভৌতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—হয় শোনা কথা, নয় ত রজ্জুতে সর্পভ্রম।'

ব্যোমকেশের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল তাহা

বোধ করি শৈলেনবাবুকে বিদ্ধ করিল ; তিনি বলিলেন, 'শুধু বরদাবাবু নয়, তারপর আরো অনেকে দেখেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিও দেখেছেন নাকি ?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ আমিও দেখেছি। হয়ত বরদাবাবুর মত অত স্পষ্টভাবে দেখি নি, তবু দেখেছি। বরদাবাবু দেখবার পর আমরা কয়েকজন আবার যেতে আরম্ভ করেছিলুম। একদিন আমি নিমেষের জন্য দেখে ফেললুম!

বরদাবাবু বলিলেন, 'সেদিন শৈলেনবাবু উত্তেজিত হয়ে একটু ভুল করে ফেলেছিলেন বলেই ভাল করে দেখতে পান নি। আমরা কয়েকজন -- আমি, অমূল্য আর ডাক্তার শচী রায় -কৈলাসবাবুর সঙ্গে কথা কইছিলুম ; তাঁকে বাড়ী ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিতে দিতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু শৈলেনবাবু শিকারীর মত জানালার দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ উনি 'ঐ--ঐ--' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমরা ধড়মড় করে ফিরে চাইলুম, কিন্তু তখন আর কিছু দেখা গেল না। শৈলেনবাবু দেখেছিলেন, একটা কুয়াসার মত বাষ্প যেন ক্রমশ আকার পরিগ্রহ করছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে materialise করবার আগেই উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তাই সব নষ্ট হয়ে গেল।'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'তবু, কৈলাসবাবুও নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিলেন। মনে নেই, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, একে তাঁর হার্ট দুর্ব্বল--; ভাগ্যে শচী ডাক্তার উপস্থিত ছিল, তাই তখনি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। নইলে হয়ত আর একটা ট্রাজেডি ঘটে যেত।'

অতঃপর প্রায় পাঁচ মিনিট আমরা সকলে নীরবে বসিয়া রহিলাম। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। অন্তত দুইটি বিশিষ্ট

ভদ্রসন্তানকে চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী বলিয়া ধরিয়া লইলে বিশ্বাস করিতে হয়। আবার গল্পটা এতই অপ্রাকৃত যে সহসা মানিয়া লইতেও মন সরে না।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তা'হলে আপনাদের মতে বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মাই তাঁর শোবার ঘরের জানালার কাছে দেখা দিচ্ছেন?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে?'

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের এ বিষয়ে মতামত কি?'

'তাঁর মতামত ঠিক বোঝা যায় না। গয়ায় পিণ্ড দেবার কথা বলেছিলুম, তা কিছুই করলেন না। বিশেষত তারাশঙ্করবাবু ত এসব কথা কানেই তোলেন না—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেন।' বরদাবাবু একটি ক্ষোভপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের একটা কিনারা হলে হয়ত তাঁর আত্মার সদ্গতি হ'ত। আমি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানি না; তবু মনে হয়, পরলোক যদি থাকে, তবে প্রেতযোনির পক্ষে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটা অস্বাভাবিক নয়।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'তা ত নয়ই। প্রেতযোনির কেবল দেহ নেই, আত্মা ত অটুট আছে। গীতায় নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি—'

বাধা দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন? তাঁকে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতুম।'

বরদাবাবু ভাবিয়া বলিলেন, 'চেষ্টা করতে পারি। আপনি ডিটেক্‌টিব শুনলে হয় ত তারাশঙ্করবাবু আপত্তি করবেন না। আজ বার লাইব্রেরীতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব; যদি তিনি রাজি হন, ওবেলা এসে আপনাকে নিয়ে যাব। তাহলে তাই কথা রইল।'

অতঃপর বরদাবাবু উঠি-উঠি করিতেছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, আমরা ভূত দেখতে পাই না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'একদিনেই যে দেখতে পাবেন এমন কথা বলি না; তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লেগে থাকতে পারলে নিশ্চয় দেখবেন। চলুন না, আজই তারাশঙ্করবাবুর বাড়ী হয়ে আপনাদের কৈলাসবাবুর বাড়ী নিয়ে যাই। কি বলেন ব্যোমকেশবাবু?'

'বেশ কথা। ওটা দেখবার আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে। আপনাদের দেশে এসেছি, একটা নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে চাই।'

'তাহলে এখন উঠি। দশটা বাজে। ওবেলা পাঁচটা নাগাদ আবার আসব।'

বরদাবাবু ও শৈলেনবাবু প্রস্থান করিবার পর শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হল? আশ্চর্য্য নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার খুনের গল্প আর বরদাবাবুর ভূতের গল্প—দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী আজগুবি বুঝতে পারছি না।'

'আমার খুনের গল্পে আজগুবি কোন্‌খানটা পেলে?'

'ছ-মাসের মধ্যে যে খুনের কিনারা হয় না তাকে আজগুবি ছাড়া আর কি বলব? বৈকুণ্ঠবাবু খুন হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ত? হার্টফেল করে মারা যান নি?'

'কি যে বল—; ডাক্তারের পোষ্ট-মর্টেম রিপোর্ট রয়েছে, গলা টিপে দম বন্ধ করে তাঁকে মারা হয়েছে। গলায় sub-cuta-neous-abrasions—'

'অথচ আততায়ীর কোনো চিহ্ন নেই, একটা আঙুলের দাগ পর্য্যন্ত না। আজগুবি আর কাকে বলে? বরদাবাবুর ত তবু একটা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভূত আছে, তোমার তাও নেই।'—ব্যোমকেশ উঠিয়া আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, 'অজিত, ওঠো—স্নান করে নেওয়া যাক্‌। ট্রেনে ঘুম হয় নি; দুপুরবেলা দিব্যি একটি নিদ্রা না দিলে শরীর ধাতস্থ হবে না।'

৩

অপরাহ্নে বরদাবাবু আসিলেন। তারাশঙ্করবাবু রাজি হইয়াছেন; যদিও একটি শোকসন্তপ্তা ভদ্রমহিলার উপর এই সব অযথা উৎপাত তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

বরদাবাবুর সঙ্গে দুইজনে বাহির হইলাম। শশাঙ্কবাবু যাইতে পারিলেন না, হঠাৎ কি কারণে উপরওয়ালার নিকট তাঁহার ডাক পড়িয়াছে।

পথে যাইতে যাইতে বরদাবাবু জানাইলেন যে, তারাশঙ্করবাবু লোক নেহাৎ মন্দ নয়, তাঁহার মত আইনজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিলও জেলার আর দ্বিতীয় নাই; কিন্তু মুখ বড় খারাপ। হাকিমরা পর্য্যন্ত তাঁহার কটু-তিক্ত ভাষাকে ভয় করিয়া চলেন। হয়ত তিনি আমাদের খুব সাদর-সম্বর্দ্ধনা করিবেন না; কিন্তু তাহা যেন আমরা গায়ে না মাখি।

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ একটু হাসিল। যেখানে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে সেখানে তাহার গায়ে গণ্ডারের চামড়া—কেহই তাহাকে অপমান করিতে পারে না। সংসর্গগুণে আমার ত্বকও বেশ পুরু হইয়া আসিতেছিল।

কেল্লার দক্ষিণ দুয়ার পার হইয়া বেলুনবাজার নামক পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। প্রধানত বাঙালী পাড়া, তাহার মধ্যস্থলে তারাশঙ্করবাবুর প্রকাণ্ড ইমারৎ। তারাশঙ্করবাবু যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

তাঁহার বৈঠকখানায় উপনীত হইয়া দেখিলাম তক্তাপোষে ফরাস পাতা এবং তাহার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গৃহস্বামী তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। শীর্ণ দীর্ঘাকৃতি লোক, দেহে মাংসের বাহুল্য নাই বরং

অভাব ; কিন্তু মুখের গঠন ও চোখের দৃষ্টি অতিশয় ধারালো। বয়স ষাটের কাছাকাছি ; পরিধানে থান ও শুভ্র পিরাণ। আমাদের আসিতে দেখিয়া তিনি গড়গড়ার নল হাতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'এস বরদা। এঁরাই বুঝি ক'লকাতার ডিটেক্‌টিব ?'

ইঁহার কণ্ঠস্বর ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু আছে যাহা শ্রোতার মনে অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করে। সম্ভবত বড় উকিলের ইহা একটা লক্ষণ ; বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষী এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া যে রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়ে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হইল না।

বরদাবাবু সঙ্কুচিতভাবে ব্যোমকেশের পরিচয় দিলেন। ব্যোমকেশ বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমি একজন সত্যান্বেষী।'

তারাশঙ্করবাবুর বাম ভ্রূর প্রান্ত ঈষৎ উত্থিত হইল—বলিলেন, 'সত্যান্বেষী ? সেটা কি ?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'সত্য অন্বেষণ করাই আমার পেশা—আপনার যেমন ওকালতি।'

তারাশঙ্করবাবুর অধরোষ্ঠ শ্লেষ-হাস্যে বক্র হইয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, 'ও—আজকাল ডিটেক্‌টিব কথাটার বুঝি আর ফ্যাশন নেই ? তা আপনি কি অন্বেষণ করে থাকেন ?'

'সত্য।'

'তা ত আগেই শুনেছি। কোন্ ধরণের সত্য ?'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'এই ধরুন, বৈকুণ্ঠবাবু আপনার কাছে কত টাকা জমা রেখে গেছেন—এই ধরণের সত্য জানতে পারলেও আপাতত আমার কাজ চলে যাবে।'

নিমেষের মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপের সমস্ত চিহ্ন তারাশঙ্করবাবুর মুখ হইতে মুছিয়া গেল। তিনি বিস্ফারিত স্থির নেত্রে ব্যোমকেশের মুখের পানে

চাহিয়া রহিলেন। তারপরে মহাবিস্ময়ে বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠ আমার কাছে টাকা রেখে গেছে, একথা আপনি জানলেন কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি সত্যান্বেষী।'

এক মিনিট কাল তারাশঙ্করবাবু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর যখন কথা কহিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; সম্ভ্রম-প্রশংসা মিশ্রিত কণ্ঠে কহিলেন, 'ভারি আশ্চর্য্য। এরকম ক্ষমতা আমি আজ পর্য্যন্ত কারুর দেখি নি।—বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? —বোসো বরদা। বলি, ব্যোমকেশবাবুরও কি তোমার মত পোষা ভূত-টুত আছে নাকি?'

আমরা চৌকিতে উপবেশন করিলে তারাশঙ্করবাবু কয়েকবার গড়গড়ার নলে ঘন ঘন টান দিয়া মুখ তুলিলেন, ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'অবশ্য আন্দাজে ঢিল ফেলেছেন, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্দাজটা পেলেন কোত্থেকে? অনুমান করতে হলেও কিছু মাল-মশ্‌লা চাই ত।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'কিছু মাল-মশ্‌লা ত ছিল। বৈকুণ্ঠবাবুর মত ধনী ব্যবসায়ী নগদ টাকা কিছু রেখে যাবেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অথচ ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা ছিল না। সম্ভবত ব্যাঙ্ক-জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তবে কোথায় টাকা রাখতেন? নিশ্চয় কোনো বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে। বৈকুণ্ঠবাবু প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর মেয়েকে আপনি নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন; সুতরাং বুঝতে হবে, আপনিই তাঁর সব চেয়ে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসভাজন বন্ধু।'

তারাশঙ্করবাবু বলিলেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। ব্যাঙ্কের ওপর বৈকুণ্ঠের বিশ্বাস ছিল না। তার নগদ টাকা যা-কিছু সব আমার কাছেই

থাকত এবং এখনো আছে। টাকা বড় কম নয়, প্রায় সতের হাজার। কিন্তু এ টাকার কথা আমি প্রকাশ করি নি ; তার মৃত্যুর পর কথাটা জানাজানি হয় আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু যখন ধরে ফেলেছেন তখন স্বীকার না করে উপায় নেই। তবু আমি চাই, যেন বাইরে কথাটা প্রকাশ না হয়। আপনারা তিনজন জানলেন ; আর কেউ যেন জানতে না পারে। বুঝলে বরদা ?'

বরদাবাবু দ্বিধা-প্রতিবিম্বিত মুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কথাটা গোপন রাখবার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি ?'

তারাশঙ্করবাবু পুনরায় বারকয়েক তামাক টানিয়া বলিলেন, 'আছে। আপনারা ভাবতে পারেন আমি বন্ধুর গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কথাটা চেপে রাখবার অন্য কারণ আছে।'

সেই কারণটি জানতে পারি না কি ?'

তারাশঙ্করবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন ; তারপর অন্দরের দিকের পর্দা-ঢাকা দরজার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া খাটো গলায় বলিলেন, 'আপনারা বোধ হয় জানেন না, বৈকুণ্ঠর একটা বকাটে লক্ষ্মীছাড়া জামাই আছে। মেয়েটাকে নেয় না, সার্কাস্ পার্টির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। উপস্থিত সে কোথায় আছে জানি না, কিন্তু সে যদি কোন গতিকে খবর পায় যে তার স্ত্রীর হাতে অনেক টাকা এসেছে তাহলে মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে যাবে। দু'দিনে টাকাগুলো উড়িয়ে আবার সরে পড়বে। আমি তা হতে দিতে চাই না—বুঝেছেন ?'

ব্যোমকেশ ফরাসের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,

তারাশঙ্করবাবু বলিতে লাগিলেন, 'বৈকুণ্ঠর যথাসর্ব্বস্ব ত চোরে নিয়ে গেছে, বাকি আছে কেবল এই হাজার কয়েক টাকা। এখন জামাই বাবাজী এসে যদি ওগুলোও ফুঁকে দিয়ে যান, তাহলে অভাগিনী মেয়েটা দাঁড়াবে কোথায়? সারা জীবন ওর চলবে কি করে? আমি ত আর চিরদিন বেঁচে থাকব না।'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'ঠিক কথা। তাঁকে গোটাকয়েক কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি বাড়ীতেই আছেন ত? যদি অসুবিধা না হয়—'

'বেশ। তাকে জেরা করে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না! কিন্তু আপনি যখন চান, এইখানেই তাকে নিয়ে আসছি।' বলিযা তারাশঙ্কর-বাবু উঠিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে আমি চক্ষু এবং ভ্রূর সাহায্যে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলাম—প্রত্যুত্তরে সে ক্ষীণ হাসিল। বরদাবাবুর সম্মুখে খোলাখুলি বাক্যালাপ হয়ত সে পছন্দ করিবে না, তাই স্পষ্টভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—তারাশঙ্করবাবু লোকটি কি রকম?

পাঁচ মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার পশ্চাতে একটি যুবতী নিঃশব্দে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় একটু আধ-ঘোমটা, মুখ দেখিবার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধক নাই; পরিধানে অতি সাধারণ সধবার সাজ। চেহারা একেবারে জলার পেত্নী না হইলেও সুশ্রী বলা চলে না। তবু চেহারার সর্ব্বাপেক্ষা বড় দোষ বোধ করি মুখের পরিপূর্ণ ভাবহীনতা। এমন ভাবলেশশূন্য মুখ চীন-জাপানের বাহিরে দেখা যায় কি না সন্দেহ। মুখাবয়বের এই প্রাণহীনতাই রূপের অভাবকে অধিক স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যতক্ষণ সে আমাদের সম্মুখে রহিল, একবারও তাহার

মুখের একটি পেশী কম্পিত হইল না, চক্ষু পলকের জন্য মাটি হইতে উঠিল না; ব্যঞ্জনাহীন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া যন্ত্রচালিতের মত পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যাহোক, সে আসিয়া দাঁড়াইতেই ব্যোমকেশ সেই দিকে ফিরিয়া ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল; তারপর সহজ স্বরে প্রশ্ন করিল, 'আপনার বাবার মৃত্যুতে আপনি যে একেবারে নিঃস্ব হন নি তা বোধ হয় জানেন?'

'হাঁ।'

'তারাশঙ্করবাবু নিশ্চয় আপনাকে বলেছেন যে আপনার সতের হাজার টাকা তাঁর কাছে জমা আছে?'

'হাঁ।'

ব্যোমকেশ যেন একটু দমিয়া গেল। একটু ভাবিযা আবার আরম্ভ করিল, 'আপনার স্বামী কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন?'

'আট বছর।'

'এই আট বছরের মধ্যে আপনি তাঁকে দেখেন নি?'

'না।'

'তাঁর চিঠিপত্রও পান নি?'

'না।'

'তিনি এখন কোথায় আছেন জানেন না?'

'না।'

'আপনি পৈতৃক টাকা পেয়েছেন জানাজানি হলে তিনি ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবেন—এ সম্ভাবনা আছে কি?'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর—

'হাঁ।'

'আপনি তাঁর কাছে যেতে চান না?'

'না!'

লক্ষ্য করিলাম তারাশঙ্করবাবু নিগূঢ় হাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ আবার অন্য পথ ধরিল।

'আপনার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?'

'যশোরে।'

'শ্বশুরবাড়ীতে কে আছে?'

'কেউ না।'

'শ্বশুর-শাশুড়ী?'

'মারা গেছেন।'

'আপনার বিয়ে হয়েছিল কোথা থেকে?'

'নবদ্বীপ থেকে।'

'নবদ্বীপে আপনার খুড়তুত জাঠতুত ভায়েরা আছে, তাদের সংসারে গিয়ে থাকেন না কেন?'

উত্তর নাই।

'তাদের আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'না।'

'তারাশঙ্করবাবুকেই সব চেয়ে বড় বন্ধু মনে করেন?'

'হাঁ।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর আবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল—

'আপনার বাবার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দেবার প্রস্তাব বরদাবাবু করেছিলেন। রাজি হন নি কেন?'

নিরুত্তর।

'ওসব আপনি বিশ্বাস করেন না?'

তথাপি উত্তর নাই।

'যাক। এখন বলুন দেখি, যে-রাত্রে আপনার বাবা মারা যান, সে-রাত্রে আপনি কোনো শব্দ শুনেছিলেন?'

'না।'

'চাঁরা জহরৎ তাঁর শোবার ঘরে থাকত?'

'হাঁ।'

'কোথায় থাকত?'

'জানি না।'

'আন্দাজ করতেও পারেন না?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে কোনো লোকের শত্রুতা ছিল?'

'জানি না।'

'আপনার বাবা আপনার সঙ্গে ব্যবসার কথা কখনো কইতেন না?'

'না।'

'রাত্রে আপনার শোবার ব্যবস্থা ছিল নীচের তলায়। কোন্ ঘরে শুতেন?'

'বাবার ঘরের নীচের ঘরে।'

'তাঁর মৃত্যুর রাত্রে আপনার নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত হয় নি?'

'না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।'

অতঃপর তারাশঙ্করবাবুর বাড়ীতে আমাদের প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। বিদায়কালে তারাশঙ্করবাবু সদয়কণ্ঠে ব্যোমকেশকে

বলিলেন, 'আমার কথা যে আপনি যাচাই করে নিয়েছেন এতে আমি খুশীই হয়েছি। আপনি হুঁসিয়ার লোক; হয় ত বৈকুণ্ঠর খুনের কিনারা করতে পারবেন। যদি কখনো সাহায্য দরকার হয় আমার কাছে আসবেন। আর মনে রাখবেন, গচ্ছিত টাকার কথা যেন চাউর না হয়। চাউর করলে বাধ্য হয়ে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে।'

রাস্তায় বাহির হইয়া কেল্লার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। দিবালোক তখন মুদিত হইয়া আসিতেছে; পশ্চিম আকাশ সিন্দূর চিহ্নিত আরসীর মত ঝকঝক করিতেছে। তাঁহার মাঝখানে বাঁকা চাঁদের রেখা—যেন প্রসাধন-রতা রূপসীর হাসির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

ব্যোমকেশের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চলিয়াছে। পাঁচ মিনিট নীরবে চলিবার পর আমি তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, তারাশঙ্করবাবুকে কি রকম বুঝলে?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; বলিল, 'ভারি বিচক্ষণ লোক।'

৪

কেল্লায় প্রবেশ করিয়া বাঁ-হাতি যে রাস্তাটা গঙ্গার দিকে গিয়াছে, তাহারি শেষ প্রান্তে কৈলাসবাবুর বাড়ী। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। অনুচ্চ প্রাচীর-ঘেরা বাগানের চারিদিকে কয়েকটি ঝাউ ও দেবদারু গাছ, মাঝখানে ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী। বৈকুণ্ঠবাবুকে যে ব্যক্তি খুন করিয়াছিল, বাড়ীটির অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাকে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

বরদাবাবু আমাদের লইয়া একেবারে উপর-তলায় কৈলাসবাবুর শয়নকক্ষে

উপস্থিত হইলেন। ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ; মধ্যস্থলে একটি লোহার খাট বিরাজ করিতেছে এবং সেই খাটের উপর পিঠে বালিস দিয়া কৈলাসবাবু বসিয়া আছেন।

একজন ভৃত্য কয়েকটা চেয়ার আনিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ছাদ হইতে ঝুলানো কেরাসিন ল্যাম্পের আলোয় প্রায়ান্ধকার ঘরের ধূসর অবসন্নতা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। মুঙ্গেরে তখনো বিদ্যুৎ-বিভার আবির্ভাব হয় নাই।

কৈলাসবাবুর চেহারা দেখিয়া তিনি রুগ্ন এ বিষয়ে সংশয় থাকে না। তাঁহার রং বেশ ফর্সা, কিন্তু রোগের প্রভাবে মোমের মত একটা অর্দ্ধ-স্বচ্ছ পাণ্ডুরতা মুখের বর্ণকে যেন নিষ্প্রাণ করিয়া দিয়াছে। মুখে সামান্য ছাঁটা দাঁড়ি আছি, তাহাতে মুখের শীর্ণতা যেন আরো পরিস্ফুট। চোখের দৃষ্টিতে অশান্ত অনুযোগ উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, কণ্ঠস্বরও দীর্ঘ রোগভোগের ফলে একটা অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে।

পরিচয় আদান-প্রদান শেষ হইলে আমরা উপবেশন করিলাম; ব্যোমকেশ জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ঐ একটিমাত্র জানালা—পশ্চিমমুখী; নীচে বাগান। দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে গঙ্গার স্রোত-রেখা দেখা যায়। এদিকে আর লোকালয় নাই, বাগানের পাঁচিল পার হইয়াই গঙ্গার চড়া আরম্ভ হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া বলিল, 'জানালাটা মাটী থেকে প্রায় পনের হাত উঁচু! আশ্চর্য্য বটে!' তারপর ঘরের চারিপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি হানিতে হানিতে চেয়ারে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ কৈলাসবাবুর সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা হইল; নূতন কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিন্তু দেখিলাম কৈলাসবাবু লোকটি অসাধারণ একগুঁয়ে। ভৌতিক কাণ্ড তিনি অবিশ্বাস করেন

না; বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছেন তাহাও তাঁহার কথার ভাবে প্রকাশ পাইল। কিন্তু তবু কোনো ক্রমেই এই হানা-বাড়ী পরিত্যাগ করিবেন না। ডাক্তার তাঁহার হৃদ্-যন্ত্রের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবাড়ী ত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার সহচরেরাও ভীত হইয়া মিনতি করিতেছে, কিন্তু তিনি রুগ্ন শিশুর মত অহেতুক জিদ ধরিয়া এই বাড়ী কামড়াইয়া পড়িয়া আছেন। কিছুতেই এখান হইতে নড়িবেন না।

হঠাৎ কৈলাসবাবু একটা আশ্চর্য্য কথা বলিয়া আমাদের চমকিত করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খিট্‌খিটে স্বরে বলিলেন, 'সবাই আমাকে এবাড়ী ছেড়ে দিতে বলছে। আরে বাপু, বাড়ী ছাড়লে কি হবে—আমি যেখানে যাব সেখানেই যে এই ব্যাপার হবে। এসব অলৌকিক কাণ্ড কেন ঘট্‌ছে তা ত আর কেউ জানে না; সে কেবল আমি জানি। আপনারা ভাবছেন, কোথাকার কোন্ বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মা এখানে আনাগোনা করছে। মোটেই তা নয়—এর ভেতর অন্য কথা আছে।'

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রকম?'

বৈকুণ্ঠ-ফৈকুণ্ঠ সব বাজে কথা—এ হচ্ছে পিশাচ। আমার গুণধর পুত্রের কীর্ত্তি।'

'সে কি?'

কৈলাসবাবুর মোমের মত গণ্ডে ঈষৎ রক্ত সঞ্চার হইল, তিনি সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ্মীছাড়া একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। ভদ্রলোকের ছেলে, জমিদারের একমাত্র বংশধর—পিশাচসিদ্ধ হতে চায়! শুনেছেন কখনো? হতভাগাকে আমি ত্যজ্য-পুত্র করেছি, তাই আমার ওপর রিষ। তার একটা মহাপাষণ্ড গুরু জুটেছে, শুনেছি শ্মশানে বসে বসে মড়ার খুলিতে করে মদ খায়। একদিন আমার

ভদ্রাসনে চড়াও হয়েছিল; আমি দরোয়ান দিয়ে চাব্‌কে বার করে দিয়েছিলুম। তাই দুজনে মিলে ষড়্ করে আমার পিছনে পিশাচ লেলিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু -'

'কুলাঙ্গার সন্তান—তার মৎলবটা বুঝতে পারছেন না? আমার বুকের ব্যামো আছে, পিশাচ দেখে আমি যদি হার্টফেল করে মরি—ব্যাস্! মাণিক আমার নিষ্কণ্টকে প্রেতসিদ্ধ গুরুকে নিয়ে বিষয় ভোগ করবেন।' কৈলাসবাবু তিক্তকণ্ঠে হাসিলেন; তারপর সহসা জানালার দিকে তাকাইয়া বিস্ফারিত চক্ষে বলিয়া উঠিলেন—'ঐ—ঐ—'

আমরা জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া কৈলাসবাবুর কথা শুনিতেছিলাম, বিদ্যুদ্বেগে জানালার দিকে ফিরিলাম। যাহা দেখিলাম—তাহাতে বুকের রক্ত হিম হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; ঘরের অনুজ্জ্বল কেরাসিন ল্যাম্পের আলোকে দেখিলাম, জানালার কালো ফ্রেমে আঁটা একটা বীভৎস মুখ! অস্থিসার মুখের বর্ণ পাণ্ডু-পীত, অধরোষ্ঠের ফাঁকে কয়েকটা পীতবর্ণ দাঁত বাহির হইয়া আছে; কালিমা-বেষ্টিত চক্ষুকোটর হইতে দুইটা ক্ষুধিত হিংস্র চোখের পৈশাচিক দৃষ্টি যেন ঘরের অভ্যন্তরটাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মুহূর্তের জন্য নিশ্চল পক্ষাহত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ দুই লাফে জানালার সম্মুখীন হইল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর মুখ তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

আমিও ছুটিয়া ব্যোমকেশের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরের অন্ধকারে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া মনে হইল যেন দেবদারু গাছের ঘন ছায়ার ভিতর দিয়া একটা শীর্ণ অতি দীর্ঘ মূর্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ দেশলাই জ্বালিয়া জানালার বাহিরে ধরিল। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম নীচে মই বা তজ্জাতীয় আরোহণী কিছুই নাই। এমন কি, মানুষ দাঁড়াইতে পারে এমন কার্ণিশ পর্য্যন্ত দেয়ালে নাই।

ব্যোমকেশের কাঠি নিঃশেষ হইয়া নিবিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল।

বরদাবাবু বসিয়া ছিলেন, উঠেন নাই। এখন ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'দেখলেন?'

'দেখলুম।'

বরদাবাবু গম্ভীরভাবে একটু হাসিলেন, তাহার চোখে গোপন বিজয়গর্ব্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রকম মনে হল?'

কৈলাসবাবু জবাব দিলেন। তিনি বালিসে ঠেস দিয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, হতাশা-মিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'কি আর মনে হবে!— এ পিশাচ। আমাকে না নিযে ছাড়বে না। ব্যোমকেশবাবু, আমার যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পিশাচের হাত থেকে কেউ কখনো উদ্ধার পেয়েছে শুনেছেন কি?' তাঁহার ভয়-বিশীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে হইল, সত্যই ইঁহার সময় আসন্ন হইয়াছে, দুর্ব্বল হৃদ্-যন্ত্রের উপর এরূপ স্নায়বিক ধাক্কা সহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'দেখুন, ভয়টাই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু—প্রেত-পিশাচ নয়। আমি বলি, বাড়ীটা না হয় ছেড়েই দিন না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আমিও তাই বলি। আমার বিশ্বাস, এ বাড়ীতে দোষ লেগেছে—পিশাচ-টিশাচ নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর অপঘাত মৃত্যুর পর থেকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পিশাচই হোক আর বৈকুণ্ঠবাবুই হোন্—মোট

কথা, কৈলাসবাবুর শরীরের যে রকম অবস্থা তাতে হঠাৎ ভয় পাওয়া ওঁর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। অতএব এ বাড়ী ছাড়াই কর্ত্তব্য।'

'আমি বাড়ী ছাড়ব না। কৈলাসবাবুর মুখে একটা অন্ধ একগুঁয়েমি দেখা দিল—'কেন বাড়ী ছাড়ব? কি করেছি আমি যে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াব? আমার নিজের ছেলে যদি আমার মৃত্যু চায়—বেশ, আমি মরব। পিতৃহত্যার পাপকে যে কুসন্তানের ভয় নেই, তার বাপ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

অভিমান ও জিদের বিরুদ্ধে তর্ক করা বৃথা। রাত্রিও হইয়াছিল। আমরা উঠিলাম। পরদিন প্রাতে আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া নীচে নামিয়া গেলাম।

পথে কোনো কথা হইল না। বরদাবাবু দু-একবার কথা বলিবার উদ্যোগ করিলেন কিন্তু ব্যোমকেশ তাহা শুনিতে পাইল না। বরদাবাবু আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

শশাঙ্কবাবু ইতিমধ্যে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই বলিলেন, 'কি হে, কি হল?'

ব্যোমকেশ একটা আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িয়া উর্দ্ধমুখে বলিল, 'প্রেতের আবির্ভাব হল।' তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলিল, 'কিন্তু বরদাবাবুর প্রেত এবং কৈলাসবাবুর পিশাচ মিলে ব্যাপারটা ক্রমেই বড় জটিল করে তুলছে।'

পরদিন রবিবার ছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যোমকেশ শশাঙ্কবাবুকে বলিল, 'চল, কৈলাসবাবুর বাড়ীটা ঘুরে আসা যাক।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'আবার ভূত দেখতে চাও নাকি? কিন্তু

দিনের বেলা গিয়ে লাভ কি? রাত্রি ছাড়া ত অশরীরীর দর্শন পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু যা অশরীরী নয়—অর্থাৎ স্থূল বস্তু—তার ত দর্শন পাওয়া যেতে পারে।'

'বেশ চল।'

সাতটা বাজিতে না বাজিতে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। কৈলাসবাবুর বাড়ী তখনো সম্পূর্ণ জাগে নাই। একটা চাকর নিদ্রালুভাবে নীচের বারান্দা ঝাঁট দিতেছে; উপরে গৃহস্বামীর কক্ষে দরজা জানালা বন্ধ। ব্যোমকেশ বলিল, 'ক্ষতি নেই। বাগানটা ততক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখি এস।

শিশির ভেজা ঘাসে সমস্ত বাগানটি আস্তীর্ণ। সোনালি রৌদ্রে দেওদারের চুনট্-করা পাতা জরীর মত ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে শারদ প্রাতের অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা। আমরা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বাগানটি পরিসরে বিঘা-চারেকের কম হইবে না কিন্তু ফুলবাগান বলিয়া কিছু নাই। এখানে সেখানে গোটা-কয়েক দোপাটি ও করবীর ঝাড় নিতান্ত আনাদৃতভাবে ফুল ফুটাইয়া রহিয়াছে। মালী নাই, বোধকরি বৈকুণ্ঠবাবুর আমলেও ছিল না। আগাছার জঙ্গল বৃদ্ধি পাইলে সম্ভবত বাড়ীর চাকরেরাই কাটিয়া ফেলিয়া দেয়।

তাহার পরিচয় বাগানের পশ্চিমদিকে এক প্রান্তে পাইলাম। দেয়ালের কোণ ঘেঁষিয়া বিস্তর আবর্জ্জনা জমা হইয়া আছে। উনানের ছাই, কাঠ-কুটা, ছেঁড়া কাগজ, বাড়ীর জঞ্জাল—সমস্তই এইখানে ফেলা হয়। বহুকালের সঞ্চিত জঞ্জাল রৌদ্রে বৃষ্টিতে জমাট বাঁধিয়া স্থানটাকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে।

এই আবর্জ্জনার গাদার উপর উঠিয়া ব্যোমকেশ অনুসন্ধিৎসুভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। জুতা দিয়া ছাই-মাটি সরাইয়া দেখিতে লাগিল। একবার একটা পুরানো টিনের কৌটা তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া আবার ফেলিয়া দিল। শশাঙ্কবাবু তাহার রকম দেখিয়া বলিলেন, কি হে, ছাইগাদার মধ্যে কি খুঁজছ ?

ব্যোমকেশ ছাইগাদা হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল, 'আমাদের প্রাচীন কবি বলেছেন—যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—এটা কি ?'

একটা চিড়্-ধরা পরিত্যক্ত লণ্ঠনের চিম্‌নি পড়িয়াছিল ; সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ তাহার খোলের ভিতর দেখিতে লাগিল। তারপর সন্তর্পণে তাহার ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া একখণ্ড জীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া আনিল। সম্ভবতঃ বায়ুতাড়িত হইয়া কাগজের টুকরাটা চিমনির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল ; তারপর দীর্ঘকাল সেইখানে রহিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ চিম্‌নি ফেলিয়া দিয়া কাগজখানা নিবিষ্ট-চিত্তে দেখিতে লাগিল। আমিও উৎসুক হইয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কাগজখানা একটা ছাপা ইস্তাহারের অর্দ্ধাংশ ; তাহাতে কয়েকটা অস্পষ্ট জন্তু জানোয়ারের ছবি রহিয়াছে মনে হইল। জল-বৃষ্টিতে কাগজের রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ছাপার কালিও এমন অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য।

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখছ হে ? ওতে কি আছে ?'

'কিছু না।' ব্যোমকেশ কাগজখানা উল্টাইয়া তারপর চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'হাতের লেখা রয়েছে।—ত্যাখ ত পড়তে পার কিনা।' বলিয়া কাগজ আমার হাতে দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলাম। হাতের লেখা যে আছে তাহা

প্রথমটা ধরাই যায় না। কালির চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই, কেবল মাঝে মাঝে কলমের আঁচড়ের দাগ দেখিয়া দু'একটা শব্দ অনুমান করা যায়—

বিপদে‥‥‥হাতে টাক‥‥

বাবা‥‥‥‥‥নচেৎ‥‥‥মরীয়া

‥‥তোমার স্বাথী‥‥‥

ব্যোমকেশকে আমার পাঠ জানাইলাম। সে বলিল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কাগজটা থাক।' বলিয়া ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল।

আমি বলিলাম, 'লেখক বোধ হয় খুব শিক্ষিত নয়—বানান ভুল করেছে। 'স্বাথী' লিখেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শব্দটা 'স্বাথী' নাও হতে পারে।'

শশাঙ্কবাবু ঈষৎ অধীরকণ্ঠে বলিলেন, 'চল চল, আস্তাকুড় ঘেঁটে লাভ নেই। এতক্ষণে বোধহয় কৈলাসবাবু উঠেছেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, ঐ যে তাঁর ভৌতিক জানালা খোলা দেখছি। চল।'

৫

বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, জানালা দিয়া কৈলাসবাবু মুখ বাড়াইয়া আছেন। শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ—প্রাতঃকাল না হইয়া রাত্রি হইলে তাঁহাকে সহসা ঐ জানালার সম্মুখে দেখিয়া প্রেত বলিয়া বিশ্বাস করিতে কাহারো সংশয় হইত না।

তিনি আমাদের উপরে আহ্বান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার জানালার নীচের মাটির উপর ক্ষিপ্রদৃষ্টি বুলাইয়া লইল। সবুজ ঘাসের পুরু

গালিচা বাড়ীর দেয়াল পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে; তাহার উপর কোনো প্রকার চিহ্ন নাই।

উপরে কৈলাসবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরে চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত। চা যদিও আমাদের একদফা হইয়া গিয়াছিল, তবু দ্বিতীয়বার সেবন করিতে আপত্তি হইল না।

চায়ের সহিত নানাবিধ আলোচনা চলিতে লাগিল। স্থানীয় জল-হাওয়ার ক্রমিক অধঃপতন, ডাক্তারদের চিকিৎসা-প্রণালীর ক্রমিক ঊর্দ্ধগতি, টোটকা ঔষধের গুণ, মারণ-উচাটন, ভূতের রোজা ইত্যাদি কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়িল না। ব্যোমকেশ তাহার মাঝখানে একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'রাত্রে আপনি জানালা বন্ধ করে শুচ্ছেন ত?'

কৈলাসবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—তিনি দেখা দিতে আরম্ভ করে অবধি জানালা দরজা বন্ধ করেই শুতে হচ্ছে—যদিও সেটা ডাক্তারের বারণ। ডাক্তার চান আমি অপর্য্যাপ্ত বায়ু সেবন করি—কিন্তু আমার যে হয়েছে উভয় সঙ্কট। কি করি বলুন?'

'জানালা বন্ধ করে কোন ফল পেয়েছেন কি?'

'বড় বেশী নয়। তবে দর্শনটা পাওয়া যায় না, এই পর্য্যন্ত। নিশুতি রাত্রে যখন তিনি আসেন, জানালায় সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে যান—একলা শুতে পারি না; রাত্রে একজন চাকর ঘরে মেঝেয় বিছানা পেতে শোয়।'

চা সমাপনান্তে ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল, 'এইবার আমি ঘরটা ভাল করে দেখব! শশাঙ্ক, কিছু মনে কোরো না; তোমাদের—অর্থাৎ পুলিশের—কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমি কটাক্ষ করছি না; কিন্তু মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যদি তোমাদের কিছু বাদ পড়ে থাকে তাই আর একবার দেখে নিচ্ছি।'

শশাঙ্কবাবু একটু বাঁকা-সুরে বলিলেন, 'তা বেশ—নাও। কিন্তু

এতদিন পরে যদি বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর কোনো চিহ্ন বার করতে পার, তাহলে বুঝব তুমি যাদুকর।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'তাই বুঝো। কিন্তু সে যাক। বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর দিন এ ঘরে কোন আসবাবই ছিল না ?'

'বলেছি ত, মাটিতে-পাতা বিছানা, জলের ঘড়া আর পানের বাটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।—হ্যাঁ, একটা তামার কাণখুস্কিও পাওয়া গিয়েছিল।'

'বেশ। আপনারা তাহলে গল্প করুন কৈলাসবাবু, আমি আপনাদের কোন বিঘ্ন করব না। কেবল ঘরময় ঘুরে বেড়াব মাত্র।'

অতঃপর ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কখনো ঊর্দ্ধমুখে ছাদের দিকে তাকাইয়া, কখনো হেঁটমুখে মেঝের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তাক্লান্ত মুখে নিঃশব্দে ঘুরিতে লাগিল। একবার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জানালার কাঠ শার্সি প্রভৃতি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল ; দরজার হুড়্‌কা ও ছিট্‌কিনি লাগাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর আবার পরিক্রমণ স্বরু করিল।

কৈলাস ও শশাঙ্কবাবু স-কৌতূহলে তাহার গতিবিধি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন জোর করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। কারণ ব্যোমকেশের মন যতই বহির্নিরপেক্ষ হোক, তিন জোড়া কুতূহলী চক্ষু অনুক্ষণ তাহার অনুসরণ করিতে থাকিলে সে যে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, যাহোক একটা কথা আরম্ভ করিয়া দিয়া ইহাদের দুইজনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। তবু, নানা অসংলগ্ন চর্চ্চার মধ্যেও আমাদের মন ও চক্ষু তাহার দিকেই পড়িয়া রহিল।

পনেরো মিনিট এইভাবে কাটিল। তারপর শশাঙ্কবাবুর একটা পুলিশ-ঘটিত কাহিনী শুনিতে শুনিতে অলক্ষিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়া-

ছিলাম, ব্যোমকেশের দিকে নজর ছিল না ; হঠাৎ ছোট্ট একটি হাসির শব্দে সচকিতে ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম, ব্যোমকেশ দক্ষিণ দিকের দেয়ালেব খুব কাছে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'কি হল আবার! হাসছ যে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাদু। দেখে যাও। এটা নিশ্চয় তোমরা আগে ছাখ নি।' বলিয়া দেওয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আমরা সাগ্রহে উঠিয়া গেলাম। প্রথমটা চূণকাম করা দেওয়ালের গায়ে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তারপর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মেঝে হইতে আন্দাজ পাঁচ ফুট উচ্চে শাদা চূণের উপর পরিষ্কার অঙ্গুষ্ঠের ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। যেন কাঁচা চূণের উপর আঙুল টিপিয়া কেহ চিহ্নটি রাখিয়া গিয়াছে।

শশাঙ্কবাবু ভ্রূকুটি সহকারে চিহ্নটি দেখিয়া বলিলেন, 'একটা বুড়ো-আঙুলের ছাপ দেখছি। এর অর্থ কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অর্থ—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। হত্যাকারীর এই পরিচয় চিহ্নটি তোমরা দেখতে পাও নি।'

বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া শশাঙ্কবাবু বলিলেন, হত্যাকারীর! এ আঙুলের দাগ যে হত্যাকারীর তা তুমি কি করে বুঝলে? আমরা আগে ওটা লক্ষ্য করি নি বটে কিন্তু তাই বলে ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ যে কেন হবে—তাও ত বুঝতে পারছি না। যে রাজমিস্ত্রি ঘর চূণকাম করেছিল তার হতে পারে ; অন্য যে-কোনো লোকের হতে পারে।'

'একেবারে অসম্ভব নয়। তবে কথা হচ্ছে, রাজমিস্ত্রি দেয়ালে নিজে আঙুলের টিপ রেখে যাবে কেন?'

'তা যদি বল, হত্যাকারীই বা রেখে যাবে কেন?'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার শশাঙ্কবাবুর দিকে তাকাইল ; তারপর বলিল, 'তাও ত বটে। তাহলে তোমার মতে ওটা কিছুই নয় ?'

'আমি বলতে চাই, ওটা যে খুব জরুরী তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।'

ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার যুক্তি অকাট্য। প্রমাণের অভাবে কোন জিনিসকেই জরুরী বলে স্বীকার করা যেতে পারে না।—পকেটে ছুরি আছে ? কিম্বা কাণখুস্কি ?'

'ছুরি আছে। কেন ?'

অপ্রসন্ন মুখে শশাঙ্কবাবু ছুরি বাহির করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের আবিষ্কারে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, তাই বোধ হয় সেটাকে তুচ্ছ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহার মনোভাব নেহাৎ অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল না : দেয়ালের গায়ে একটা আঙুলের চিহ্ন—কবে কাহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে কিছুই জানা নাই—হত্যাকাণ্ডের রহস্য-সমাধানে ইহার মূল্য কি ? এবং যদি উহা হত্যাকারীরই হয় তাহা হইলেই বা লাভ কি হইবে ? কে হত্যাকারী তাহাই যখন জানা নাই তখন এই আঙুলের টিপ্ কোন কাজে লাগিবে তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না।

ব্যোমকেশ কিন্তু ছুরি দিয়া চিহ্নটির চারিধারে দাগ কাটিতে আরম্ভ করিল। অতি সন্তর্পণে চূণ-বালি আল্‌গা করিয়া ছুরির নখ দিয়া একটু চাড় দিতেই টিপ-চিহ্ন সমেত খানিকটা প্ল্যাষ্টার বাহির হইয়া আসিল। ব্যোমকেশ সেটি সযত্নে রুমালে জড়াইয়া পকেটে রাখিয়া কৈলাসবাবুকে বলিল—'আপনার ঘরের দেয়াল কুশ্রী করে দিলুম। দয়া করে একটু চূণ দিয়ে গর্ত্তটা ভরাট করিয়ে নেবেন।' তারপর শশাঙ্কবাবুকে বলিল, 'চল শশাঙ্ক, এখানকার কাজ আপাতত আমাদের শেষ হয়েছে।

এদিকে দেখছি ন'টা বাজে ; কৈলাসবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।—ভাল কথা, কৈলাসবাবু, আপনি বাড়ী থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র পান ত ?'

কৈলাসবাবু বলিলেন, 'আমাকে চিঠি দেবে কে ? এক মাত্র ছেলে—তার গুণের কথা ত শুনেছেন চিঠি দেবার মত আত্মীয় আমার কেউ নেই।'

প্রফুল্লস্বরে ব্যোমকেশ বলিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়। আচ্ছা আজ তাহলে চললুম ; মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করতে আসব। আর দেখুন, এটার কথা কাউকে বলে দরকার নেই।' বলিয়া দেয়ালের ছিদ্রের দিকে নির্দ্দেশ করিল।

কৈলাসবাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। রৌদ্র তখন কড়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিলাম।

হঠাৎ শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যোমকেশ, ওই আঙুলের দাগটা সম্বন্ধে তোমার সত্যিকার ধারণা কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার ধারণা ত বলেছি, ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ।'

অধীরভাবে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'কিন্তু এ যে তোমার জবরদস্তি। হত্যাকারী কে তার নামগন্ধও জানা নেই—অথচ তুমি বলে বসলে ওটা হত্যাকারীর। একটা সঙ্গত কারণ দেখান চাই ত।'

'কি রকম সঙ্গত কারণ তুমি দেখতে চাও।'

শশাঙ্কবাবুর কণ্ঠের বিরক্তি আর চাপা রহিল না, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি কিছুই দেখতে চাই না। আমার মনে হয় তুমি নিছক ছেলেমানুষী করছ। অবশ্য তোমার দোষ নেই ; তুমি ভাবছ বাঙ্গলা দেশে

যে প্রথায় অনুসন্ধান চলে এদেশেও বুঝি তাই চলবে। সেটা তোমার ভুল। ও ধরণের ডিটেক্‌টিবগিরিতে এখানে কোন কাজ হবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাই, আমার ডিটেক্‌টিব বিছে কাজে লাগাবার জন্য ত আমি তোমার কাছে আসি নি, বরং ওটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই এসেছি। তুমি যদি মনে কর এ ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করবার দরকার নেই তাহলে ত আমি নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে যাই।'

শশাঙ্কবাবু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'না, আমি তা বলছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য, ওপথে চললে কস্মিন কালেও কিছু করতে পারবে না—এ ব্যাপার অত সহজ নয়।'

'তা ত দেখতেই পাচ্ছি।'

'ছমাস ধরে আমরা যে-ব্যাপারের একটা হদিস বার করতে পারলুম না, তুমি একটা আঙুলের টিপ্ দেখেই যদি মনে কর তার সমাধান করে ফেলেছ, তাহলে বুঝতে হবে এ কেসের গুরুত্ব তুমি এখনো ঠিক ধরতে পার নি। আঙুলের দাগ কিম্বা আঁস্তাকুড়ে কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া কাগজে দুটো হাতের অক্ষর—এসব দিয়ে লোমহর্ষণ উপন্যাস লেখা চলে, পুলিশের কাজ চলে না। তাই বলছি, ওসব আঙুলের টিপ্-ফিপ্ ছেড়ে—'

'থামো।'

পাশ দিয়া একখানা ফীটন গাড়ী যাইতেছিল, তাহার আরোহী আমাদের দেখিয়া গাড়ী থামাইলেন; গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ব্যোমকেশবাবু, কদ্দূর?'

তারাশঙ্করবাবু গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন; কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, গায়ে নামাবলী, মুখে একটু ব্যঙ্গ-হাস্য।

ব্যোমকেশ তাঁহার প্রশ্নে ভালমানুষের মত প্রতিপ্রশ্ন করিল—'কিসের?'

'কিসের আবার—বৈকুণ্ঠের খুনের। কিছু পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন? আমার ত কিছু জানবার কথা নয়। বরং শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করুন।'

তারাশঙ্করবাবু বাম ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া বলিলেন, 'কিন্তু শুনেছিলুম যেন, আপনিই নূতন করে এ কেসের তদন্ত করবার ভার পেয়েছেন! তা সে যা হোক, শশাঙ্কবাবু খবর কি? নূতন কিছু আবিষ্কার হল?'

শশাঙ্কবাবু নীরসকণ্ঠে বলিলেন, 'আবিষ্কার হলেও পুলিশের গোপন কথা সাধারণে প্রকাশ করবার আমার অধিকার নেই। আর, ওটা আপনি ভুল শুনেছেন—ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, মুঙ্গেরে বেড়াতে এসেছে; তদন্তের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই।'

পুলিশের সহিত উকিলের প্রণয় এ জগতে বড়ই দুর্লভ। দেখিলাম, তারাশঙ্করবাবু ও শশাঙ্কবাবুর মধ্যে ভালবাসা নাই। তারাশঙ্কর কণ্ঠস্বরে অনেকখানি মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'বেশ বেশ। তাহলে কিছুই পারেন নি। আপনাদের দ্বারা যে এর বেশী হবে না তা আগেই আন্দাজ করেছিলুম।—হাঁকো।'

তারাশঙ্করবাবুর ফীটন বাহির হইয়া গেল।

শশাঙ্কবাবু কট্‌মট্ চক্ষে সেইদিকে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে যাহা বলিলেন তাহা প্রিয়-সম্ভাষণ নয়। ভিতরে ভিতরে সকলেরই মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। পথে আর কোন কথা হইল না, নীরবে তিনজনে বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম।

৬

দুপুর বেলাটা ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। একবার ছেঁড়া কাগজখানা ও আঙুলের টিপ্‌ বাহির করিয়া অবহেলাভরে দেখিল; আবার সরাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার মনের ক্রিয়া ঠিক বুঝিলাম না; কিন্তু বোধ হইল, এই হত্যার ব্যাপারে এতাবৎকাল সে যেটুকু আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল তাহাও যেন নিবিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্ণে বরদাবাবু আসিলেন। বলিলেন, 'এখানে আমাদের বাঙালীদের একটা ক্লাব আছে, চলুন আজ আপনাদের সেখানে নিয়ে যাই।'

'চলুন।'

দুইদিন এখানে আসিয়াছি কিন্তু এখনো স্থানীয় দ্রষ্টব্য বস্তু কিছুই দেখি নাই; তাই বরদাবাবু আমাদের কষ্টহারিণীর ঘাট, পীর-শানফার কবর ইত্যাদি কয়েকটা স্থান ঘুরাইয়া দেখাইলেন। তারপর সূর্য্যাস্ত হইলে তাঁহাদের ক্লাবে লইয়া চলিলেন।

কেল্লার বাহিরে ক্লাব। পথে যাইতে দেখিলাম—একটা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড তাঁবু পড়িয়াছে; তাহার চারিদিকে মানুষের ভিড়—তাঁবুর ভিতর হইতে উজ্জ্বল আলো এবং ইংরাজী বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওটা কি?'

'একটা সার্কাস-পার্টি এসেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে সার্কাস-পার্টিও আসে নাকি?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আসে বৈকি। বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার

করে নিয়ে যায়। এই ত গত বছর একদল এসেছিল—না গত বছর নয়, তার আগের বছর।'

'এরা কতদিন হল এসেছে?'

'কাল শনিবার ছিল, কাল থেকে এরা খেলা দেখাতে সুরু করেছে।'

প্রসঙ্গত সহরের আমোদ-প্রমোদের অভাব সম্বন্ধে বরদাবাবু অভিযোগ করিলেন। মুষ্টিমেয় বাঙালীর মধ্যে চিরন্তন দলাদলি, তাই থিয়েটারের একটা সখের দল থাকা সত্ত্বেও অভিনয় বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না; বাহির হইতে এক আধটা কার্ণিভালের দল যাহা আসে তাহাই ভরসা। শুনিয়া খুব বেশী বিস্মিত হইলাম না। বাঙালীর বাস্তব জীবনে যে জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের অসদ্ভাব, তাহা সে থিয়েটারের রাজা বা সেনাপতি সাজিয়া মিটাইয়া লইতে চায়। তাই যেখানে দুইজন বাঙালী আছে সেইখানেই থিয়েটার ক্লাব থাকতে বাধ্য এবং যেখানে থিয়েটার ক্লাব আছে সেখানে দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমোদ-প্রমোদের জন্য চালানি মালের উপর নির্ভর করিতে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

শুনিতে শুনিতে ক্লাবে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ক্লাবের প্রবেশ পথটি সঙ্কীর্ণ হইলেও ভিতরে বেশ সুপ্রসর। খানিকটা খোলা যায়গার উপর কয়েকখানি ঘর। আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি ঘরে ফরাস পাতা, তাহার উপর বসিয়া কয়েকজন সভ্য ব্রিজ্ খেলিতেছেন; প্রতি হাত খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিতেছেন, আবার খেলা আরম্ভ হইবামাত্র সকলে গম্ভীর ও স্বল্পবাক হইয়া পড়িতেছেন। ক্রীড়াচক্রের বাহিরে তাঁহাদের চিত্ত কোন অবস্থাতেই সঞ্চারিত হইতেছে না; আমরা দুইজন আগন্তুক আসিলাম তাহা কেহ লক্ষ্যই করিলেন না। ঘরের এক কোণে দুইটি সভ্য দাবার ছক মধ্যস্থলে লইয়া তুরীয় সমাধির অবস্থায় উত্তীর্ণ

হইয়াছেন, সুতরাং বাজি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কঠোর তপস্যা অপ্সরার ঝাঁক আসিয়াও ভাঙিতে পারিবে না।

পাশের ঘর হইতে কয়েকজন উত্তেজিত সভ্যের গলার আওয়াজ আসিতেছিল, বরদাবাবু আমাদের সেই ঘরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, একটি টেবিল বেষ্টন করিয়া কয়েকজন যুবক বসিয়া আছেন—তন্মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত শৈলেনবাবুও বর্ত্তমান। তাঁহাকে বাকি সকলে সপ্তরথীর মত ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভূতযোনি সম্বন্ধে নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ ও সন্দেহমূলক বাক্যজালে বিদ্ধ করিয়া প্রায় ধরাশায়ী করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

বরদাবাবুকে দেখিয়া শৈলেনবাবুর চোখে পরিত্রাণের আশা ফুটিয়া উঠিল, তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'আসুন বরদাবাবু, এঁরা আমাকে একেবারে—; এই যে, ব্যোমকেশবাবু, আপনারাও এসেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক।'

নবাগত দুইজনকে দেখিয়া তর্ক বন্ধ হইল। বরদাবাবু আমাদের পরিচয় দিয়া, আমরা উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে কেন? কি হয়েছে?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'ওঁরা আমার ভূত দেখার কথা বিশ্বাস করছেন না, বলছেন ওটা আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত একটা বায়বীয় মূর্ত্তি।'

পৃথ্বীশবাবু নামক একটি ভদ্রলোক বলিলেন, 'আমরা বলতে চাই, বরদার আষাঢ়ে গল্প শুনে শুনে ওঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে উনি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছেন। বস্তুত যেটাকে উনি ভূত মনে করছেন সেটা হয়ত একটা বাদুড় কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু।'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'আমি স্বীকার করছি যে আমি স্পষ্টভাবে কিছু দেখি নি। তবু বাদুড় যে নয় একথা আমি হলফ্ নিয়ে বলতে পারি।

আর বরদাবাবুর গল্প শুনে আমি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি এ অপবাদ যদি দেন—'

বরদাবাবু আমাদের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'এঁরা দুজন কাল সকালে এখানে এসেছেন। এঁদেরও আমি গল্প শুনিয়ে বশীভূত করে ফেলেছি বলে সন্দেহ হয় কি?'

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেন, 'না, তা হয় না। তবে সময় পেলে—'

বরদাবাবু বলিলেন, 'ওঁরা কাল রাত্রে দেখেছেন।'

সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপর পৃথ্বীশবাবু ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্যি দেখেছেন?'

ব্যোমকেশ স্বীকার করিল, 'হ্যাঁ।'

'কি দেখেছেন?'

'একটা মুখ।'

প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিলেন। তখন ব্যোমকেশ যে অবস্থায় ঐ মুখ দেখিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল। শুনিয়া সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। বরদাবাবু ও শৈলেনবাবুর মুখে বিজয়ীর গর্ব্বোল্লাস ফুটিয়া উঠিল।

অমূল্যবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তর্কে যোগ দেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে অনিচ্ছা পীড়িত প্রত্যয় এবং অবরুদ্ধ অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যাহা বিশ্বাস করিতে চাহি না তাহাই অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বাস করিতে হইলে মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হয় তাহার মনের অবস্থাও সেইরূপ—কোন প্রকারে এই অনীপ্সিত বিশ্বাসের মূল ছেদন করিতে পারিলে তিনি বাঁচেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন, বিরুদ্ধতার শ্লেষ কণ্ঠ হইতে যথাসম্ভব অপসারিত করিয়া বলিলেন, 'তা যেন হল, অনেকেই যখন দেখেছেন বলছেন—তখন না হয় ঘটনাটা সত্যি বলেই মেনে

নেওয়া গেল। কিন্তু কেন? বৈকুণ্ঠ জহুরী যদি ভূতই হয়ে থাকে তাহলে কৈলাসবাবুকে বিরক্ত করে তার কি লাভ হচ্ছে? এই কথাটা আমায় কেউ বুঝিয়ে দিতে পার?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'প্রেতযোনির উদ্দেশ্য সব সময় বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হয় বৈকুণ্ঠবাবু কিছু বলতে চান।'

অমূল্যবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, 'বলতে চান ত বলছেন না কেন?'

'সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁকে দেখেই আমরা এত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ছি যে তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। তাছাড়া, প্রেতাত্মার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবার ক্ষমতা থাকলেও কথা কইবার ক্ষমতা সর্ব্বত্র থাকে না। এক্‌টোপ্লাজ্‌ম্ নামক যে-বস্তুটা মূর্ত্তি-গ্রহণের উপাদান—'

'পাণ্ডিত্য ফলিও না বরদা। Spiritualismএর বইগুলো যে ঝাড়া মুখস্থ করে রেখেছ তা আমরা জানি। কিন্তু তোমার বৈকুণ্ঠবাবু যদি কথাই না বলতে পারবেন তবে নিরীহ একটি ভদ্রলোককে নাহক জ্বালাতন করছেন কেন?'

'মুখে কথা বলতে না পারলেও তাঁকে কথা বলাবার উপায় আছে।'

'কি উপায়?'

'প্ল্যাঞ্চেট।'

'ও—সেই তেপায়া টেবিল? সে ত জুচ্চুরি।'

'কি করে জানলে? কখনো পরীক্ষা করে দেখেছ?'

অমূল্যবাবুকে নীরব হইতে হইল। তখন বরদাবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেখুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৈকুণ্ঠবাবুর কিছু বক্তব্য আছে; হয় ত তিনি হত্যাকারীর নাম বলতে চান। আমাদের উচিত তাঁকে সাহায্য করা। প্ল্যাঞ্চেটে তাঁকে ডাকলে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। করবেন প্ল্যাঞ্চেট?'

ভূত নামানো কখনও দেখি নাই ; ভারি আগ্রহ হইল। বলিলাম, 'বেশ ত, করুন না। এখনি করবেন ?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'দোষ কি ? এইখানেই করা যাক—কি বল তোমরা ? ভূত যদি নামে, তোমাদের সকলেরই সন্দেহ ভঞ্জন হবে।'

সকলেই সোৎসাহে রাজি হইলেন।

একটি ছোট টিপাই তৎক্ষণাৎ আনানো হইল। বরদাবাবু বলিলেন যে, বেশী লোক থাকিলে চক্র ভাল হইবে না, তাই পাঁচজনকে বাছিয়া লওয়া হইল। বরদাবাবু, ব্যোমকেশ, শৈলেনবাবু, অমূল্যবাবু ও আমি রহিলাম। বাকি সকলে পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।

আলো কমাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজন টিপাইয়ের চারিদিকে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। কি করিতে হইবে বরদাবাবু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন টিপাইয়ের উপর আল্‌গোছে হাত রাখিয়া পরস্পর আঙুলে আঙুল ঠেকাইয়া মুদিত চক্ষে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যান স্বরু করিয়া দিলাম। ঘরের মধ্যে আবছায়া অন্ধকার ও অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট এইভাবে কাটিল। ভূতের দেখা নাই। মনে আবল-তাবল চিন্তা আসিতে লাগিল ; জোর করিয়া মনকে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যানে জুড়িয়া দিতে লাগিলাম। এইরূপ টানাটানিতে বেশ অধীর হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল টিপাইটা যেন একটু নড়িল। হঠাৎ দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম, আঙুলের স্নায়ুগুলা নিরতিশয় সচেতন হইয়া রহিল।

আবার টিপাই একটু নড়িল, যেন ধীরে ধীরে আমার হাতের নীচে ঘুরিয়া যাইতেছে।

বরদাবাবুর গম্ভীর স্বর শুনিলাম—'বৈকুণ্ঠবাবু এসেছেন কি ? যদি এসে থাকেন একবার টোকা দিন।'

কিছুক্ষণ কোন সাড়া নাই। তারপর টিপাইয়ের একটা পায়া ধীরে ধীরে শূন্যে উঠিয়া ঠক্ করিয়া মাটিতে পরিল।

বরদাবাবু গভীর অথচ অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, 'আবির্ভাব হয়েছে!'

স্নায়ুর উত্তেজনা আরো বাড়িয়া গেল; কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। চক্ষু মেলিয়া কিন্তু একটা বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করিলাম। কি দেখিব আশা করিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু দেখিলাম যেমন পাঁচ জনে আধা অন্ধকারে বসিয়াছিলাম তেমনি বসিযা আছি, কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইতিমধ্যে যে একটা গুরুতর রকম অবস্থান্তর ঘটিয়াছে—এই ঘরে আমাদেরই আশেপাশে কোথাও এক অশরীরী আত্মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বরদাবাবু নিম্নস্বরে আমাদের বলিলেন, 'আমিই প্রশ্ন করি—কি বলেন?'

আমরা শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি জানাইলাম। তখন তিনি ধীর গম্ভীর-কণ্ঠে প্রেতযোনিকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন—

'আপনি কি চান?'

কোনো উত্তর নাই। টিপাই অচল হইয়া রহিল।

'আপনি বারবার দেখা দিচ্ছেন কেন?'

মনে হইল টিপাই একটু নড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা গেল না।

'আপনার কিছু বক্তব্য আছে?'

এবার টিপাইয়ের পায়া স্পষ্টতঃ উঠিতে লাগিল। কয়েকবার ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল—অর্থ কিছু বোধগম্য হইল না।

বরদাবাবু কহিলেন, 'যদি হ্যাঁ বলতে চান একবার টোকা দিন, যদি না বলতে চান দুবার টোকা দিন।'

একবার টোকা পড়িল।

দেখিলাম, পরলোকের সহিত ভাব বিনিময়ের প্রণালী খুব সরল নয়। 'হাঁ' বা 'না' কোনোক্রমে বোঝানো যায়; কিন্তু বিস্তারিতভাবে মনের কথা প্রকাশ করা অশরীরীর পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু তবু মানুষের বুদ্ধি দ্বারা সে বাধাও কিয়ৎপরিমাণে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে—সংখ্যার দ্বারা অক্ষর বুঝাইবার রীতি আছে। বরদাবাবু সেই রীতি অবলম্বন করিলেন; প্রেতযোনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনি যা বলতে চান, অক্ষর গুণে গুণে টোকা দিন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব।'

তখন টেলিগ্রাফে কথা আরম্ভ হইল। টিপাইয়ের পায়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কয়েকবার নড়ে, আবার স্তব্ধ হয়; আবার নড়ে—আবার স্তব্ধ হয়। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে কথাগুলি অতি কষ্টে বাহির হইয়া আসিল তাহা এই—

বাড়ী—ছেড়ে—যাও—নচেৎ—অমঙ্গল—

টিপাইয়ের শেষ শব্দ থামিয়া যাইবার পর আমরা কিছুক্ষণ ভয়-স্তম্ভিতবৎ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরদাবাবু গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'আপনার বাড়ী যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা তার চেষ্টা করব। আর কিছু বলতে চান কি?'

টিপাই স্থির।

আমার হঠাৎ একটা মনে হইল, বরদাবাবুকে চুপি চুপি বলিলাম, 'হত্যাকারী কে জিজ্ঞাসা করুন।'

বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। খানিকক্ষণ কোন উত্তর আসিল না; তারপর পায়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

তা—রা—তা—রা—তা—রা—

হঠাৎ টিপাই কয়েকবার সজোরে নড়িয়া উঠিয়া থামিয়া গেল। বরদাবাবু কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'কি বললেন, বুঝতে পারলুম না। 'তারা'—কি? কারুর নাম?

টিপাইয়ে সাড়া নাই।

আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি আছেন?'

কোনো উত্তর আসিল না, টিপাই আবার জড় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

তখন বরদাবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'চলে গেছেন।'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল; তারপর সকলের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নেহাৎ অরসিকের মত বলিল, 'মাফ করবেন, এখন কেউ টিপাই থেকে হাত তুলবেন না। আপনাদের হাত আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

বরদাবাবু ঈষৎ হাসিলেন—'আমরা কেউ হাতে আঠা লাগিয়ে রেখেছি কিনা দেখতে চান? বেশ—দেখুন।'

ব্যোমকেশের ব্যবহারে আমি বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। এমন খোলাখুলিভাবে এতগুলি ভদ্রলোককে প্রবঞ্চক মনে করা নিতান্তই শিষ্টতাবিগর্হিত। তাহার মনে একটা প্রবল সংশয় জাগিয়াছে সত্য—কিন্তু তাই বলিয়া এমন কঠোরভাবে সত্য পরীক্ষা করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। সকলেই হয় ত মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু ব্যোমকেশ নির্লজ্জভাবে প্রত্যেকের হাত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এমন কি, আমাকেও বাদ দিল না।

কিন্তু কাহারো হাতেই কিছু পাওয়া গেল না। ব্যোমকেশ তখন দুই

করতলে গণ্ড রাখিয়া টিপাইয়ের উপর কনুই স্থাপন পূর্ব্বক শূন্যদৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকাইয়া রহিল।

বরদাবাবু খোঁচা দিয়া বলিলেন, 'কিছু পেলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আশ্চর্য্য! এ যেন কল্পনা করাও যায় না।'

বরদাবাবু প্রসন্নস্বরে বলিলেন, 'There are more things—'

অমূল্যবাবুর বিরুদ্ধতা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অসংযত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'কিন্তু—তারা তারা কথার মানে কেউ বুঝতে পারলে?'

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। আমার মাথায় হঠাৎ বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল—তারাশঙ্কর। আমি ঐ নামটাই উচ্চারণ করিতে যাইতেছিলাম, ব্যোমকেশ আমার মুখে থাবা দিয়া বলিল, 'ও আলোচনা না হওয়াই ভাল।'

বরদাবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ, আমরা যা জানতে পেরেছি তা আমাদের মনেই থাক।' সকলে তাঁহার কথায় গম্ভীর উদ্বিগ্নমুখে সায় দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজকের অভিজ্ঞতা বড় অদ্ভুত—এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। বরদাবাবু এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ী ফিরিবার পথে বরদাবাবুর সহিত শৈলেনবাবু এবং অমূল্যবাবু আমাদের সাথী হইলেন। তাঁহাদেরও বাসা কেল্লার মধ্যে।

আমাদের বাসা নিকটবর্ত্তী হইলে শৈলেনবাবু বলিলেন, 'একলা বাসায় থাকি, আজ রাত্রে দেখছি ভাল ঘুম হবে না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনার আর ভয় কি? ভয় কৈলাসবাবুর। —আচ্ছা, ওকে বাড়ী ছাড়াবার কি করা যায় বলুন ত?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকে ও-বাড়ী ছাড়াতেই হবে। আপনারা ত

চেষ্টা করছেনই, আমিও করব। কৈলাসবাবু অবুঝ লোক, তবু ওঁর ভালর জন্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে।—কিন্তু বাড়ী পৌঁছে যাওয়া গেছে, আর আপনারা কষ্ট করবেন না। নমস্কার।'

তিনজনে শুভনিশি জ্ঞাপন করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। অমূল্যবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'শৈলেনবাবু, আপনি বরং আজকের রাতটা আমার বাসাতেই থাকবেন চলুন। আপনিও একলা থাকেন, আমার বাসাতেও উপস্থিত আমি ছাড়া আর কেউ নেই—'

বুঝিলাম প্ল্যাঞ্চেটের ব্যাপার সকলের মনের উপরেই আতঙ্কের ছায়া ফেলিয়াছে।

৭

শশাঙ্কবাবু বোধহয় মনে মনে ব্যোমকেশ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই সেদিন কৈলাসবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে হত্যার প্রসঙ্গ আর ব্যোমকেশের সম্মুখে উত্থাপিত করেন নাই। তাছাড়া হঠাৎ তাঁহার অফিসে কাজের চাপ পড়িয়াছিল, পূজার ছুটির প্রাক্কালে অবকাশেরও অভাব ঘটিয়াছিল।

অতঃপর দুই তিনদিন আমরা সহরে ও সহরের বাহিরে যত্র তত্র পরিভ্রমণ করিয়া কাটাইয়া দিলাম। স্থানটা অতি প্রাচীন, জরাসন্ধের আমল হইতে ক্লাইভের সময় পর্য্যন্ত বহু কিম্বদন্তী ও ইতিবৃত্ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জমা হইয়াছে। পুরাবৃত্তের দিকে যাঁহাদের ঝোঁক আছে তাঁহাদের কাছে স্থানটি পরম লোভনীয়।

এই সব দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ যেন হত্যাকাণ্ডের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। শুধু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সে কৈলাসবাবুর বাসায় গিয়া

জুটিত এবং নানাভাবে তাঁহাকে বাড়ী ছাড়িবার জন্য প্ররোচিত করিত। তাহার সুকৌশল বাক্য-বিন্যাসের ফলও ফলিয়াছিল, কৈলাসবাবু নিমরাজি হইয়া আসিয়াছিলেন।

শেষে সপ্তাহখানেক পরে তিনি সম্মত হইয়া গেলেন। কেল্লার বাহিরে একখানা ভাল বাড়ী পাওয়া গিয়াছিল, আগামী রবিবারে তিনি সেখানে উঠিয়া যাইবেন স্থির হইল।

রবিবার প্রভাতে চা খাইতে খাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'শশাঙ্ক, এবার আমাদের তল্‌পি তুলতে হবে। অনেকদিন হয়ে গেল।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'এরি মধ্যে! আর দুদিন থেকে যাও না। কলকাতায় তোমার কোনো জরুরী কাজ নেই ত।' তাঁহার কথাগুলি শিষ্টতাসম্মত হইলেও কণ্ঠস্বর নিরুৎসুক হইয়া রহিল।

ব্যোমকেশ উত্তরে বলিল, 'তা হয় ত নেই! কিন্তু তবু কাজের প্রত্যাশায় দোকান সাজিয়ে বসে থাকতে হবে ত।'

'তা বটে। কবে যাবে মনে করছ?'

'আজই। তোমার এখানে ক'দিন ভারি আনন্দে কাটল—অনেক-দিন মনে থাকবে।'

'আজই? তা—তোমাদের যাতে সুবিধা হয়—' শশাঙ্কবাবু কিয়ৎকাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর একটু বিরস স্বরে কহিলেন, 'সে ব্যাপারটার কিছুই হল না। জটিল ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই; তবু ভেবেছিলুম, তোমার যে রকম নাম-ডাক, হয় ত কিছু করতে পারবে।

'কোন্ ব্যাপারের কথা বলছ?'

'বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের ব্যাপার। কথাটা ভুলেই গেলে নাকি?'

'ও—না ভুলি নি। কিন্তু তাতে জানবার কিছু নেই।'

'কিছু নেই! তার মানে? তুমি সব জেনে ফেলেছ নাকি?'

'তা—একরকম জেনেছি বৈ কি।'

'সে কি! তোমার কথা ত ঠিক বুঝতে পারছি না।' শশাঙ্কবাবু ঘুরিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'কেন—বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে যা-কিছু জানবার ছিল তা ত অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি—তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?'

শশাঙ্কবাবু স্তম্ভিতভাবে তাকাইয়া রহিলেন—'কিন্তু—অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছ—কি বলছ তুমি? বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী কে তা জানতে পেরেছ?'

'সে ত গত রবিবারই জানা গেছে।'

'তবে—তবে—এতদিন আমায় বল নি কেন?'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল—'ভাই, তোমার ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল যে পুলিশ আমার সাহায্য নিতে চায় না; বাংলাদেশে আমরা যে-প্রথায় কাজ করি সে-প্রথা তোমাদের কাছে একেবারে হাস্যকর, আঙুলের টিপ এবং ছেঁড়া কাগজের প্রতি তোমাদের অশ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাই আর আমি উপযাচক হয়ে কিছু বলতে চাই নি। লোমহর্ষণ উপন্যাস মনে করে তোমরা সমস্ত পুলিশ-সম্প্রদায় যদি একসঙ্গে অট্টহাস্য স্রুরু করে দাও—তাহলে আমার পক্ষে সেটা কি রকম সাংঘাতিক হয়ে উঠবে একবার ভেবে দ্যাখো।'

শশাঙ্কবাবু ঢোক গিলিলেন—'কিন্তু—আমাকে ত ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারতে। আমি ত তোমার বন্ধু! সে যাক, এখন কি জানতে পেরেছ শুনি।' বলিয়া তিনি ব্যোমকেশের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল।

'কে খুন করেছে? তাকে আমরা চিনি?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

তাহার উরুর উপর হাত রাখিয়া প্রায় অনুনয়ের কণ্ঠে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'সত্যি বল ব্যোমকেশ, কে করেছে?'

'ভূত।'

শশাঙ্কবাবু বিমূঢ় হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ঠাট্টা করছ নাকি! ভূতে খুন করেছে?'

'অর্থাৎ—'হ্যাঁ, তাই বটে।'

অধীর স্বরে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বল ব্যোমকেশ। যদি তোমার সত্যিসত্যি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে ভূতে খুন করেছে—তাহলে—' তিনি হতাশভাবে হাত উল্টাইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া বারান্দায় একবার পায়চারি করিয়া বলিল, 'সব কথা তোমাকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হলে আজ আমার যাওয়া হয় না—রাত্রিটা থাকতে হয়। আসামীকে তোমার হাতে সমর্পণ না করে দিলে তুমি বুঝবে না। আজ কৈলাসবাবু বাড়ী বদল করবেন; সুতরাং আশা করা যায় আজ রাত্রেই আসামী ধরা পড়বে।' একটু থামিয়া বলিল, 'আর কিছু নয়, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের জন্যই দুঃখ হয়।—যাক, এখন কি করতে হবে বলি শোনো।'

* * * *

আশ্বিন মাস, দিন ছোট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছটার মধ্যে সন্ধ্যা হয় এবং নয়টা বাজিতে না বাজিতে কেল্লার অধিবাসিবৃন্দ নিদ্রালু হইয়া শয্যা আশ্রয় করে। গত কয়েকদিনেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

সে রাত্রে ন'টা বাজিবার কিছু পূর্বে আমরা তিনজনে বাহির হইলাম।

ব্যোমকেশ একটা টর্চ্চ সঙ্গে লইল, শশাঙ্কবাবু একযোড়া হাতকড়া পকেটে পুরিয়া লইলেন।

পথ নির্জ্জন ; আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রকে ঢাকিয়া দিয়াছে। রাস্তার ধারে বহুদূর ব্যবধানে যে নিষ্প্রভ কেরাসিন-বাতি ল্যাম্পপোষ্টের মাথায় জ্বলিতেছিল তাহা রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে মাত্র। পথে জনমানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।

কৈলাসবাবুর পরিত্যক্ত বাসার সম্মুখে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন সরকারি খাজনাখানা হইতে নয়টার ঘণ্টা বাজিতেছে। শশাঙ্কবাবু এদিক ওদিক তাকাইয়া মৃদু শিষ্ দিলেন ; অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা লোক বাহির হইয়া আসিল—তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, অস্পষ্ট পদশব্দে বুঝিলাম। ব্যোমকেশ তাহাকে চুপি চুপি কি বলিল, সে আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আমরা সন্তর্পণে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। শূন্য বাড়ী, দরজা জানালা সব খোলা—কোথাও একটা আলো জ্বলিতেছে না। প্রাণহীন শবের মত বাড়ীখানা যেন নিস্পন্দ হইয়া আছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। কৈলাসবাবুর ঘরের সম্মুখে ব্যোমকেশ একবার দাঁড়াইল, তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়া টর্চ্চ জ্বালিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। ঘর শূন্য—খাট বিছানা যাহা ছিল কৈলাসবাবুর সঙ্গে সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। খোলা জানালা পথে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস নিরাভরণ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

দরজা ভেজাইয়া ব্যোমকেশ টর্চ্চ নিবাইয়া দিল। তারপর মেঝেয় উপবেশন করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'বোসো তোমরা। কতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে কিছু ঠিক নেই, হয় ত রাত্রি তিনটে পর্য্যন্ত এইভাবে বসে

থাকতে হবে।—অজিত, আমি টর্চ্চ জ্বাললেই তুমি গিয়ে জানালা আগ্‌লে দাঁড়াবে; আর শশাঙ্ক তুমি পুলিসের কর্ত্তব্য করবে—অর্থাৎ প্রেতকে প্রাণপণে চেপে ধরবে।'

অতঃপর অন্ধকারে বসিয়া আমাদের পাহারা আরম্ভ হইল। চুপচাপ তিনজনে বসিয়া আছি, নড়ন-চড়ন নাই; নড়িলে বা একটু শব্দ করিলে ব্যোমকেশ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া যে সময়ের অন্ত্যেষ্টি করিব তাহারও উপায় নাই, গন্ধ পাইলে শিকার ভড়কাইয়া যাইবে। বসিয়া বসিয়া আর এক রাত্রির দীর্ঘ প্রতীক্ষা মনে পড়িল, চোরাবালির ভাঙা কুঁড়ে ঘরে অজানার উদ্দেশ্যে সেই সংশয়পূর্ণ জাগরণ। আজিকার রাত্রিও কি তেমনি অভাবনীয় পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে?

খাজনাখানার ঘড়ি দুইবার প্রহর জানাইল—এগারোটা বাজিয়া গেল। তিনি কখন আসিবেন তাহার স্থিরতা নাই; এদিকে চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিতেছে।

এই ত কলির সন্ধ্যা—ভাবিতে ভাবিতে একটা অদম্য হাই তুলিবার জন্য হাঁ করিয়াছি, হঠাৎ ব্যোমকেশ সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া আমার উরু চাপিয়া ধরিল। হাই অর্দ্ধপথে হেঁচ্‌কা লাগিয়া থামিয়া গেল।

জানালার কাছে শব্দ। চোখে কিছুই দেখিলাম না, কেবল একটা অস্পষ্ট অতি লঘু শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া গেল। তারপর আর কোনো সাড়া নাই। নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম, বাহিরে কিছুই শুনিতে পাইলাম না—শুধু নিজের বুকের মধ্যে দুন্দুভির মত একটা আওয়াজ ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা আমাদের খুব কাছে, ঘরের মেঝের উপর পা ঘষিয়া চলার মত খস্‌ খস শব্দ শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলাম। একজন ঘরে প্রবেশ

করিয়াছে, আমাদের দুই হাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—অথচ তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে কি আমাদের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছে? কে সে? এবার কি করিবে? আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া একটা ঠাণ্ডা শিহরণ বহিয়া গেল।

প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি যেমন ছিদ্র পথে বদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সূক্ষ্ম আলোর রেখা ঘরের মধ্যস্থলে জন্মলাভ করিয়া আমাদের সম্মুখের দেয়াল স্পর্শ করিল। অতি ক্ষীণ আলো কিন্তু তাহাতেই মনে হইল যেন ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম একটা দীর্ঘাকৃতি কালো মূর্ত্তি আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই হস্তস্থিত ক্ষুদ্র টর্চ্চের আলো যেন দেয়ালের গায়ে কি অন্বেষণ করিতেছে।

কৃষ্ণ মূর্ত্তিটা ক্রমে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে দেয়ালের শাদা চূণকাম পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার গলা দিয়া একটা অব্যক্ত আওয়াজ বাহির হইল, যেন যাহা খুঁজিতেছিল তাহা সে পাইয়াছে।

এই সময় ব্যোমকেশের হাতের টর্চ্চ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলোক ক্ষণকালের জন্য চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। তারপর আমি ছুটিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

আগন্তুকও তড়িৎবেগে ফিরিয়া চোখের সম্মুখে হাত তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার মুখখানা প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যে অনেকগুলা ঘটনা প্রায় একসঙ্গে ঘটিয়া গেল। আগন্তুক বাঘের মত আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, শশাঙ্কবাবু তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি করিয়া ভূমিসাৎ হইলাম।

ঝুটোপুটি ধস্তাধস্তি কিন্তু থামিল না। শশাঙ্কবাবু আগন্তুককে কুস্তিগিরের মত মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; আগন্তুক তাঁহার স্কন্ধে সজোরে কামড়াইয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। শশাঙ্কবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, তিনি তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না; তদবস্থায় টানিতে টানিতে জানালার দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় টর্চ্চের আলোয় তাহার বিকৃত বীভৎস রং-করা মুখখানা দেখিতে পাইলাম। প্রেতাত্মাই বটে।

ব্যোমকেশ শান্ত সহজ স্বরে বলিল, 'শৈলেনবাবু, জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাবেন। আপনার 'রণ-পা' ওখানে নেই, তার বদলে জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সদলবলে জানালার নীচে অপেক্ষা করছেন।' তারপর গলা চড়াইয়া হাঁকিল, 'জমাদারসাহেব, উপর আইয়ে।'

সেই বিকট মুখ আবার ঘরের দিকে ফিরিল। শৈলেনবাবু! আমাদের নিরীহ শৈলেনবাবু—এই! বিস্ময়ে মনটা যেন অসাড় হইয়া গেল।

শৈলেনবাবুর বিকৃত মুখের পৈশাচিক ক্ষুধিত চক্ষু দুটা ব্যোমকেশের দিকে ক্ষণেক বিস্ফারিত হইয়া রহিল, দাঁতগুলা একবার হিংস্র শ্বাপদের মত বাহির করিলেন, যেন কি বলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মুখ দিয়া একটা গোঙানির মত শব্দ বাহির হইল মাত্র। তারপর সহসা শিথিল দেহে তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

শশাঙ্কবাবু তাঁহার পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'শশাঙ্ক, শৈলেনবাবুকে তুমি চেনো বটে কিন্তু ওঁর সব পরিচয় বোধহয় জান না। কাঁধ দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখছি; ও কিছু নয়, টিঞ্চার

আয়োডিন লাগালেই সেরে যাবে। তাছাড়া, পুলিসের অধিকার যখন গ্রহণ করেছ তখন তার আনুষঙ্গিক ফলভোগ করতে হবে বই কি। সে যাক, শৈলেনবাবুর আসল পরিচয়টা দিই। উনি হচ্চেন সার্কাসের একজন নামজাদা জিম্‌ন্যাষ্টিক খেলোয়াড় এবং ৺বৈকুণ্ঠবাবুর নিরুদ্দিষ্ট জামাতা। সুতরাং উনি যদি তোমার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েই থাকেন তাহলে তুমি সেটাকে জামাইবাবুর রসিকতা বলে ধরে নিতে পার।'

শশাঙ্কবাবু কিন্তু রসিকতা বলিয়া মনে করিলেন না ; গলার মধ্যে একটা নাতি-উচ্চ গর্জ্জন করিয়া জামাইবাবুর প্রকোষ্ঠে হাতকড়া পরাইলেন। এবং জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সেই সঙ্গে তাহার বিরাট গালপাট্টা ও চোগোঁফা লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'সতেরো মিনিট রয়েছে মাত্র। অতএব চটপট আমার কৈফিয়ৎ দাখিল করে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করব।'

বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর অ্যারেষ্টের ফলে সহরে বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, বলাই বাহুল্য। ব্যোমকেশই যে এই অঘটন সম্ভব করিয়াছে তাহাও কি জানি কেমন করিয়া চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। শশাঙ্কবাবু প্রীতি ও সন্তোষের ভাব চেষ্টা করিয়াও আর রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাই আমার আর অযথা বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই মনস্থ করিয়াছিলাম।

কৈলাসবাবু তাঁহার পূর্ব্বতন বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে বিদায়ের পূর্ব্বে আমরা সমবেত হইয়াছিলাম। শশাঙ্কবাবু, বরদাবাবু, অমূল্যবাবু উপস্থিত ছিলেন ; কৈলাসবাবু শয্যায় অর্দ্ধশয়ান

থাকিয়া মুখে অনভ্যস্ত প্রসন্নতা আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্রের উপর মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তিনি যে অনুতপ্ত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল।

তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'এখন বুঝতে পারছি ভূত নয় পিশাচ নয়—শৈলেনবাবু। উঃ—লোকটা কি ধড়িবাজ! মনে আছে—একবার এই ঘরে বসে 'ঐ ঐ' করে চেঁচিয়ে উঠেছিল? আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি। কিছুই দেখে নি—শুধু আমাদের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা। সে নিজেই যে ভূত এটা যাতে আমরা কোন মতেই না বুঝতে পারি। যাহোক ব্যোমকেশ-বাবু, এবার কৈফিয়ৎ পেশ করুন—আপনি বুঝলেন কি করে?'

সকলে উৎসুক নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া আরম্ভ করিল, 'বরদাবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু প্রেতযোনি সম্বন্ধে আমার মনটা গোড়া থেকেই নাস্তিক হয়ে ছিল। ভূত পিশাচ আছে কিনা এ প্রশ্ন আমি তুলছি না; কিন্তু যিনি কৈলাসবাবুকে দেখা দিচ্ছেন তিনি যে ভূত-প্রেত নন—জলজ্যান্ত মানুষ এ সন্দেহ আমার সুরুতেই হয়েছিল। আমি নেহাৎ বস্তুতান্ত্রিক মানুষ, নিরেট বস্তু নিয়েই আমার কারবার করতে হয়; তাই অতীন্দ্রিয় জিনিসকে আমি সচরাচর হিসেবের বাইরে রাখি।

'এখন মনে করুন, যদি ঐ ভূতটা সত্যিই মানুষ হয়, তবে সে কে এবং কেন এমন কাজ করছে—এ প্রশ্নটা স্বতঃই মনে আসে। একটা লোক খামকা ভূত সেজে বাড়ীর লোককে ভয় দেখাচ্ছে কেন? এর একমাত্র উত্তর, সে বাড়ীর লোককে বাড়ী-ছাড়া করতে চায়। ভেবে দেখুন, এ ছাড়া আর অন্য কোন সদুত্তর থাকতে পারে না।

'বেশ। এখন প্রশ্ন উঠ্‌ছে—কেন বাড়ী-ছাড়া করতে চায়? নিশ্চয় তার কোন স্বার্থ আছে। কি সে স্বার্থ?

'আপনারা সকলেই জানেন, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যবান হীরা জহরৎ কিছুই পাওয়া যায় নি। পুলিশ সন্দেহ করেন যে তিনি একটা কাঠের হাতবাক্সে তাঁর অমূল্য সম্পত্তি রাখতেন এবং তাঁর হত্যাকারী সেগুলো নিয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু এটা এত সহজে বিশ্বাস করতে পারি নি। 'ব্যয়কুণ্ঠ' বৈকুণ্ঠবাবুর চরিত্র যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় তিনি মূল্যবান হীরে-মুক্তো কাঠের বাক্সে ফেলে রাখবার লোক ছিলেন না। কোথায় যে তিনি সেগুলোকে রাখতেন তাই কেউ জানে না। অথচ এই ঘরেই সেগুলো থাকত।—প্রশ্ন—কোথায় থাকত।

'কিন্তু এ প্রশ্নটা এখন চাপা থাক। এই ভৌতিক উৎপাতের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ এই হতে পারে না যে, বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী তাঁর জহরৎগুলো নিয়ে যাবার সুযোগ পায় নি, অথচ কোথায় সেগুলো আছে তা সে জানে। তাই সে এ বাড়ীর নূতন বাসিন্দাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে; যাতে সে নিরুপদ্রবে জিনিসগুলো সরাতে পারে।

'সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভূতই বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে প্রশ্ন করে আমার দুটো বিষয়ে খট্‌কা লেগে-ছিল। প্রথম, তিনি সে-রাত্রে কোন শব্দ শুনতে পান নি। এটা আমার অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তিনি এই ঘরের নীচের ঘরেই শুতেন, অথচ তার বাপকে গলা টিপে মারবার সময় যে ভীষণ ধস্তাধস্তি হয়েছিল তার শব্দ কিছুই শুনতে পান নি। আততায়ী বৈকুণ্ঠবাবুর গলা টিপে কোথায় তিনি হীরে জহরৎ রাখেন সে-খবর বার করে নিয়েছিল—অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে বাক্য-বিনিময় হয়েছিল। হয় ত বৈকুণ্ঠবাবু চীৎকারও করেছিলেন—অথচ তাঁর মেয়ে কিছুই শুনতে পান নি। এ কি সম্ভব?

'দ্বিতীয় কথা। বাপের আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি গয়ায় পিণ্ড দিতে অনিচ্ছুক। আসল কথা, তিনি জানেন তাঁর বাপ প্রেতযোনি প্রাপ্ত

হয় নি, তাই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেতযোনি যে কে তাও সম্ভবত তিনি জানেন। নচেৎ একজন অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোক জেনে শুনে বাপের পারলৌকিক ক্রিয়া করবে না—এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে সম্বন্ধে অনেকগুলো সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে—সবগুলো তলিয়ে দেখার দরকার নেই। তার মধ্যে প্রধান এই যে, তিনি জানেন কে হত্যা করেছে এবং তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন। স্ত্রীলোকের এমন কে আত্মীয় থাকতে পারে যে বাপের চেয়েও প্রিয়? উত্তর নিষ্প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে যে সুচরিত্রা সে খবর আমি প্রথমদিনই পেয়েছিলুম। সুতরাং স্বামী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই যে হত্যাকারী তার আর একটা ইঙ্গিত গোড়াগুড়ি পেয়েছিলুম। প্রেতাত্মাটা পনেরো হাত লম্বা, দোতলার জানালা দিয়ে অবলীলাক্রমে উঁকি মারে। সহজ মানুষের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয়? মইও ব্যবহার করে না—মই ঘাড়ে করে অত শীঘ্র অন্তর্ধান সম্ভব নয়। তবে? এর উত্তর—রণ-পা। নাম শুনেছেন নিশ্চয়! দুটো লম্বা লাঠি, তার ওপর চড়ে সেকালে ডাকাতেরা বিশ-ত্রিশ ক্রোশ দূরে ডাকাতি করে আবার রাতারাতি ফিরে আসত। বর্ত্তমান কালে সার্কাসে রণ-পা চড়ে অনেক খেলোয়াড় খেলা দেখায়। রীতিমত অভ্যাস না থাকলে কেউ রণ-পা চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। কাজেই হত্যাকারী যে সার্কাস-সম্পর্কিত লোক হতে পারে এ অনুমান নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর বয়াটে জামাই সার্কাসদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, নিশ্চয় ভাল খেলোয়াড়—সুতরাং অনুমানটা আপনা থেকেই দৃঢ় হয়ে ওঠে।

'কিন্তু সবাই জানে—জামাই দেশে নেই—আট বছর নিরুদ্দেশ। সে হঠাৎ এসে জুটল কোথা থেকে?

'সেদিন এই বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটা কাগজের

টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। অনেকদিনের জীর্ণ একটা সার্কাসের ইস্তাহার, তাতে আবার সিংহের ছবি তখনো সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। তার উল্টো পিঠে হাতের অক্ষরে কয়েকটা বাংলা শব্দ লেখা ছিল। মনে হয় যেন কেউ চিঠির কাগজের অভাবে এই ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছে। চিঠির কথাগুলো অসংলগ্ন, তবু তা থেকে একটা অর্থ উদ্ধার করা যায়। যে স্বামী অর্থাভাবে পড়ে স্ত্রীর কাছে টাকা চাইছে। অজিত, তুমি যে শব্দটা 'স্বাথী' পড়েছিলে সেটা প্রকৃতপক্ষে 'স্বামী'।

'বোঝা যাচ্ছে, স্বামী সুদূর প্রবাস থেকে অর্থাভাবে মরীয়া হয়ে স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিল। বলা বাহুল্য, অর্থ সাহায্য সে পায় নি। বৈকুণ্ঠবাবু একটা লক্ষ্মীছাড়া পত্নীত্যাগী জামাইকে টাকা দেবেন একথা বিশ্বাস্য নয়।

'এই গেল বছরখানেক আগেকার ঘটনা। দু'বছরের মধ্যে এ সহরে কোনো সার্কাস-পার্টি আসে নি; অতএব বুঝতে হবে যে প্রবাস থেকেই স্বামী এই চিঠি লিখেছিলেন এবং তখনো তিনি সার্কাসের দলে ছিলেন—শাদা কাগজের অভাবে ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছিলেন।

'কয়েকমাস পরে স্বামী একদা মুঙ্গেরে এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে কোথা থেকে টাকা যোগাড় করেছিলেন জানি না; তিনিএসে স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের মত বাস করতে লাগলেন। মুঙ্গেরে কেউ তাঁকে চেনে না—তাঁর বাড়ী যশোরে আর বিয়ে হয়েছিলে নবদ্বীপে—তাই বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই বলে ধরা পড়বার ভয় তাঁর ছিল না।

'বৈকুণ্ঠবাবু বোধ হয় জামায়ের আগমনবার্ত্তা শেষ পর্য্যন্ত জানতেই পারেন নি, তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। জামাইটি কিন্তু আড়ালে থেকে শ্বশুর সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে তৈরী হলেন; শ্বশুর যখন স্বেচ্ছায় কিছু দেবেন না তখন জোর করেই তাঁর উত্তরাধিকারী হবার সঙ্কল্প করলেন।

'তার পর সেই রাত্রে তিনি রণ-পায়ে চড়ে শ্বশুরবাড়ী গেলেন, জানালা দিয়ে একেবারে শ্বশুরমশায়ের শোবার ঘরে অবতীর্ণ হলেন। এই আকস্মিক আবির্ভাবে শ্বশুর বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন, জামাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। কথায় বলে জামাতা দশম গ্রহ। বাবাজী প্রথমে শ্বশুরের গলা টিপে তাঁর হীরা জহরতের গুপ্তস্থান জেনে নিলেন, তারপর তাঁকে নিপাত করে ফেললেন। তিনি বেঁচে থাকলে অনেক ঝঞ্ঝাট, তাই তাঁকে শেষ করে ফেলবার জন্তেই জামাই তৈরী হয়ে এসেছিলেন।

'কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে হীরা জহরতগুলো আত্মসাৎ করবার ফুরসৎ হল না। ইতিমধ্যে নীচে স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, তিনি এসে দোর ঠেলাঠেলি করছিলেন।

'তাড়াতাড়ি জামাইবাবু একটিমাত্র জহরৎ বার করে নিয়ে সে রাত্রির মত প্রস্থান করলেন। বাকিগুলো যথাস্থানেই রয়ে গেল।

'বৈকুণ্ঠবাবু জহরৎগুলি রাখতেন বড় অদ্ভুত যায়গায় অর্থাৎ ঘরের দেয়ালে। দেয়ালের চূণ-সুরকি খুঁড়ে সামান্ত গর্ত্ত করে, তাতেই মণিটা রেখে, আবার চূণ দিয়ে গর্ত্ত ভরাট করে দিতেন। তাঁর পাণের বাটায় যথেষ্ট চূণ থাকত, কোন হাঙ্গামা ছিল না। বার করবার প্রয়োজন হলে কাণখুস্কির সাহায্যে চূণ খুঁড়ে বার করে নিতেন।

'জামাইবাবু একটি জহরৎ দেয়াল থেকে বার করে নিয়ে যাবার আগে গর্ত্তটা তাড়াতাড়ি চূণ দিয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে কাজ ভাল হয় না, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ চূণের ওপর আঁকা রয়ে গেল।

'বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর মণি-মুক্তা কোথায় রাখেন, এ প্রশ্নটা প্রথমে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর সেদিন এঘরে পায়চারি করতে করতে যখন ঐ আঙুলের টিপ্ চোখে পড়ল, তখন এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বুঝতে পারলুম। এই ঘরের দেয়ালে যত্রতত্র চূণের প্রলেপের আড়ালে

আড়াই লক্ষ টাকার জহরৎ লুকোনো আছে। এমনভাবে লুকোনো আছে যে খুব ভাল করে দেয়ালে পরীক্ষা না করলে কেউ ধরতে পারবে না। শশাঙ্ক, তোমাকে মেহনৎ করে এই পঞ্চাশটি জহরৎ বার করতে হবে। আমার আর সময় নেই, নইলে আমিই বার করে দিতুম। তবু পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে ঢ্যারা দিয়ে রেখেছি, তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

'যাক। তাহলে আমরা জানতে পারলুম যে, জামাই বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে একটা জহরৎ নিয়ে গেছে এবং অন্যগুলো হস্তগত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু জামাই লোকটা কে? নিশ্চয় সে এই সহরেই থাকে এবং সম্ভবত আমাদের পরিচিত। তার আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু কেবলমাত্র আঙুলের ছাপ দেখে সহরসুদ্ধ লোকের ভিতর থেকে একজনকে খুঁজে বার করা যায় না। তবে উপায়?

'সেদিন প্ল্যাঞ্চেট টেবিলে সুযোগ পেলুম। টেবিলে ভূতের আবির্ভাব হল। আমি বুঝলুম আমাদেরই মধ্যে একজন টেবিল নাড়ছেন এবং তিনিই হত্যাকারী: ভূতের কথাগুলোই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। একটা ছুতো করে আমি আপনাদের সকলের হাত পরীক্ষা করে দেখলুম। শৈলেনবাবুর সঙ্গে আঙুলের দাগ মিলে গেল।

'সুতরাং শৈলেনবাবুই যে হত্যাকারী তাতে আর সন্দেহ রইল না। আমাদেরও বোধহয় আর সন্দেহ নেই। বরদাবাবুর শিষ্য হয়ে শৈলেনবাবুর কাজ হাসিল করবার খুব সুবিধা হয়েছিল। লোকটি বাইরে বেশ নিরীহ আর মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাঘের মত ক্রূর আর নিষ্ঠুর। দয়ামায়ার স্থান ওর হৃদয়ে নেই।

ব্যোমকেশ চুপ করিল। সকলে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তারপর অমূল্যবাবু প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আঃ—বাঁচলুম। ব্যোমকেশবাবু, আর কিছু না হোক বরদার ভূতের

হাত থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। যে রকম করে তুলেছিল—আর একটু হলে আমিও ভূত বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম আর কি! আপনি বরদার ভূতের রোজা, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

সকলে হাসিলেন। বরদাবাবু বিড়বিড় করিয়া গলার মধ্যে কি বলিলেন; শুনিয়া অমূল্যবাবু বলিলেন, 'ওটা কি বললে? সংস্কৃত বুলি আওড়াচ্ছ মনে হল।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'মৌক্তিকং ন গজে গজে। একটা হাতীর মাথায় গজমুক্তা পাওয়া গেল না বলে গজমুক্তা নেই একথা সিদ্ধ হয় না।'

অমূল্যবাবু বলিলেন, 'গজের মাথায় কি আছে কখনো তল্লাস করি নি, কিন্তু তোমার মাথায় যা আছে তা আমরা সবাই জানি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সতেরো মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এবার তাহলে উঠ্‌লুম—নমস্কার। তারাশঙ্করবাবুর কাছে আগেই বিদায় নিয়ে এসেছি—মহাপ্রাণ লোক। তাঁকে আবার আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। এস অজিত।'

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬